সাধন-সোপান

প্রথম ভাগ

(জীবন গঠন)

গুপ্তিপাড়া বাস্তব্য।
সাধক পণ্ডিত শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ।

সাধন-সোপান

প্রথম ভাগ

(জীবন গঠন)

উদাসীনো হ্যুদাসীনাং বনস্থো বনবাসিনাং।
যতীনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী॥
(কুলচূড়ামণিতন্ত্র)

যতেদীক্ষা, পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনাং।
বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণ দায়িকা॥
(গণেশবিমর্ষিণীতন্ত্র)

রত্নাকর, রাজ্যশ্রী, তুলসাদাস, বৃহৎ নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি, পুরাণকথা
প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, শিমলাশৈলস্থ কালীবাড়ীর ভূতপূর্ব্ব
প্রধান পুরোহিত, বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতির পরীক্ষক,
জামসেদপুর কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা ও সেবা-
য়েৎ, গুপ্তিপাড়া দয়াময়ী দুর্গামাতার
প্রতিষ্ঠাতা সাধক পণ্ডিত

শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ ঠাকুর

—প্রণীত—

প্রকাশক :—শ্রীব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য্য
কালীবাড়ী, জামসেদপুর।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

মূল্য ১৷৹ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য।
তারা পেণ্ট ষ্টোরস্।
২৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। শ্রীশিবানন্দ ভট্টাচার্য্য।
জামসেদপুর, কালীবাড়ী।

৩। শ্রীকানাইলাল শীল।
ডায়মণ্ড লাইব্রেরী।
১০৫ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত।
৩০শে ভাদ্র, ১৩৪৭ সাল।

মুদ্রাকর :—
শ্রীহরিসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাণীপ্রেস, জামসেদপুর।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

বিশ্বনিয়ন্ত্রী মায়ের ইচ্ছায় আজ সাধনসোপান প্রথমভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আদর্শহারা গৃহস্থাশ্রমীকে আদর্শের সন্ধান দিতে, বন্ধনের মাঝে মহানন্দময় মুক্তির আস্বাদ দিতে, কৌপীন ও প্রব্রজ্যার কৌলিন্যের নিকটে অবনত শির বিলুপ্তসন্তান গার্হস্থ্য আশ্রমকে তার প্রাচীন সম্মানে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, এই সাধনসোপান তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে কার্য্যকরী হইয়াছে, এই দ্বিতীয় সংস্করণ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষাসংসর্গ পরিস্থিতির উন্মত্ত কম্পনে এই সাধনসোপান খানি যে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায় নাই, ইহা বিশ্বনিয়ন্ত্রী মায়ের একান্ত ইচ্ছা। বিরুদ্ধভাব প্রবাহ আজ হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ করবার জন্য মুহুর্মূহু হুঙ্কার ছাড়ছে। এ অবস্থায় জীবন গঠনমূলক এই সাধনসোপান খানি সমাজের কল্যান সাধন করিতে পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত হইতেছে; এজন্য আমি সমাজ কল্যাণকামীদের নিকট কৃতজ্ঞ।

গার্হস্থ্যধর্ম্মে নিত্য উপাসনায় অনুরাগী হওয়াই ইহার প্রথম পাদপীঠ। নিত্যউপাসনা ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হয় না ~~হইলে~~ প্রকৃত শান্তির সন্ধান পাওয়া যায় না, ইহাই আমাদের প্রাচীনতম আর্য্যঋষির বাণী, কিভাবে অনুষ্ঠান পরায়ণ হইলে সেই বাণীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহারই বিস্তৃত বিন্যাস এই গ্রন্থের প্রতি ছত্রে ছত্রে শাস্ত্রপ্রমাণে আলোচিত হইয়া সরল সহজসাধ্য পথ প্রদর্শন করিয়াছে। এবং আমাদের অসংযত তামসিক জীবনকে আদর্শপথে অগ্রসর হইতে প্রচুর সহায়তা করিতেছে। ওঁ শান্তি॥

শুভ ১লা বৈশাখ,
সন ১৩৫৩ সাল।

শ্রীবারিদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ।
কলিকাতা আশুতোষ ইনষ্টিটিউশনের
বাংলার শিক্ষক।

সূচীপত্র।

পণ্ডিত শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ প্রতিষ্ঠিত
জামসেদপুর কালীবাড়ী আশ্রম হইতে প্রচারিত।

11/29

১। সাধনসোপান প্রথমভাগ, (জীবনগঠন) মূল্য ১॥০ টাকা।
এই পুস্তকে সহজ সাধনপদ্ধতি, গুরুকরণের আবশ্যকতা, গুরুনির্ব্বাচনে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত, দীক্ষা ও জপের প্রণালী ও গৃহস্থ কিভাবে সাংসারিক আবর্জ্জনার মধ্যে থেকেও ধীরে ধীরে ঈশ্বরমুখী জীবন গঠন করিতে পারেন তাহা যুক্তিপূর্ণ ভাবে শাস্ত্রপ্রমাণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে

২। সাধনসোপান দ্বিতীয়ভাগ (জীবন্মুক্তি) মূল্য ১॥০ টাকা।
এই পুস্তকে গৃহস্থ কিভাবে তার ঈশ্বরমুখী গঠিত জীবনকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতে পারেন, সস্ত্রীক সাধনার দ্বারা ক্রমবিকাশের ধাপে ধাপে গৃহস্থ এক কর্ত্তৃত্ববোধে কেমন করিয়া জীবন্মুক্তির কোঠায় পৌঁছাইতে পারেন তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে বলিদানের নিগূঢ় রহস্য, পঞ্চতত্ব পঞ্চমকার সাধনায় তন্ত্রশাস্ত্রে ব্রহ্ম বিদ্যালাভের অনবদ্য উপায়, পাপপুণ্যের বিচার, অষ্টাঙ্গযোগ, ব্রহ্ম-গায়ত্রীর ব্যাখ্যা, মায়াবাদ, গুণভেদে রূপভেদ প্রভৃতি বিষয়গুলি উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে শাস্ত্রপ্রমাণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৩। সাধনসোপান তৃতীয়ভাগ (আদর্শ জীবন) ॥০ আনা।
এই পুস্তকে প্রকৃত মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি, আদর্শ কি, নিত্য উপাসনার ভিতর দিয়া কেমনভাবে অগ্রসর হইলে, আদর্শ জীবন লাভ করিয়া স্থায়ী সুখের অধিকারী হওয়া যায়, কিভাবে কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর দিয়া পরমার্থ লাভ করা যায়, তাহার বিশদ আলোচনা আছে।

৪। পুরাণ কথা প্রথম খণ্ড মূল্য ১৲ টাকা।
এই পুস্তকে দেবী ভাগবতের কয়েকটী চিত্তাকর্ষক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মৎস্যগন্ধার উৎপত্তি, নরনারায়ণ ব্যাসদেবের জন্ম, পরাশরের অপূর্ব্ব বিভূতি, দেবর্ষি নারদের নারীমূর্ত্তিগ্রহণ, আবার দেবর্ষির শুভবিবাহ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রদ উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে।

৫। পুরাণকথা দ্বিতীয়ভাগ মূল্য ১৲ শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে। এই পুস্তকে মহর্ষি ভৃগু, চ্যবন ও শুক্রাচার্য্যের অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভৃগুপত্নী পুলমাদেবীর তপঃশক্তি, শুক্রাচার্য্যের মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রলাভ, ভক্তপ্রধান প্রহ্লাদের স্বজাতি দৈত্যগণের রক্ষার্থে যুদ্ধে যোগদান, প্রতিকারবিধান প্রভৃতি সমাজকল্যাণকর শিক্ষাপ্রদ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানগর্ভ উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। ইহা ধর্ম্ম-পিপাসু, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, এমন কি সাধারণ নরনারীগণেরও আনন্দ-দায়ক বিষয়ে পরিপূর্ণ।

সাধনসোপান সম্বন্ধে কয়েকটী কথা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। অমৃতবাজার পত্রিকা—৫।১১।৪৪

In the first volume of the "Sadhan Sopan" the objective of the learned author was the building up of the spiritual life in family environments. In the second volume we are told how according to shastric injuctions we can achieve freedom from material bondage and achieve salvation. In lucid and clear Bengali, the readers are told how they can escape the all-branching meshes of illusion and be one with the Infinite. It is a book which all spiritually-minded persons will immensly enjoy

২। আনন্দবাজার পত্রিকা—১।৭।৪৫—সুপণ্ডিত গ্রন্থকার গৃহস্থের আদর্শজীবনের সম্বন্ধে আলোচ্য পুস্তকখানিতে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে ধর্ম্মসাধনা সম্বন্ধে অনেক কুসংস্কার দূর হইবে। সংযম এবং পবিত্রার পথে মনকে সুগঠিত করিয়া মানুষ কিভাবে স্থায়ী সুখ ও শান্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে, গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকে সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টভাবে তাহার একটা ধারণা

আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রতিপাদ্য বিষয় সহজ ও সরল করিয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার বক্তব্যকে জটিল করিয়া তোলে নাই। প্রত্যক্ষ অনুভূতি তাঁহার যুক্তিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে আমরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া উপকৃত হইয়াছি।

৩। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয়,—আপনার রচিত সাধনসোপান অধ্যয়ন করিয়াছি। ঐহিক ও পারত্রিক সিদ্ধির মূলীভূত চিত্তভূমির এই মহাবিপ্লবের যুগে আপনার রচিত "সাধন-সোপান" প্রকৃতই সোপানশ্রেণীর ন্যায় উর্দ্ধগতির পক্ষে পরমসহায়ক হইবে, আপনার রচনা গভীর তত্ত্বপূর্ণ সুসংযত ও সুন্দর। উহা যেমন চিত্তে গভীর জ্ঞানধাবার বিকাশ সাধন করে, তেমনই নির্ম্মল আনন্দের সৃষ্টি করে। আশা করি আপনার মধুময়সারসম্ভূতলেখনী আরও এইজাতীয় গ্রন্থরাজি প্রকাশ করিয়া জগতের মহাকল্যাণ বিধান করিবে।

৪। অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ এম, এ, পি, আর, এস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ-পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত সাধনসোপান (দ্বিতীয়ভাগ) পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি, গুরুশিষ্যসংবাদ মুখে আলোচিত দুরূহ তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য গ্রন্থকার যেরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহাতে ধর্ম্ম ও সাধন সম্বন্ধে আগ্রহশীল আস্তিক ব্যক্তি মাত্রই সংস্কৃত মূলগ্রন্থপাঠের আয়াস ব্যতীতও নিজ নিজ আগ্রহ চরিতার্থ করিবার অবসর পাই-বেন। তত্ত্বজিজ্ঞাসু বঙ্গভাষিক ব্যক্তি মাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। শ্রীভগবৎচরণে প্রার্থনা, সুধীসাধক গ্রন্থকার মহোদয়ের উদ্দেশ্য সফল হউক।

৫। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, টি, প্রধানশিক্ষক কুমার আশুতোষ ইনষ্টিটিউশন কলিকাতা, ঃ-সাধক পণ্ডিত শ্রীভূপতি

চরণ ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের লিখিত সাধনসোপান পাঠ করিয়া পরম সন্তোষলাভ করিলাম। সংহিতা ও ব্রাহ্মণের ন্যায় ইহাতে যেমন কর্ম্মকাণ্ড সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, আবার আরণ্যকের ন্যায় ইহাতে তেমন জ্ঞানকাণ্ডও স্থানলাভ করিয়াছে। জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে লেখক যে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সাধনালব্ধ গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলি যথাসম্ভব সহজ ও সরল ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, বর্ত্তমানে নানাকারণে আমাদের ধর্ম্মজীবনে যে গ্লানি প্রবেশ করিয়াছে, সেই গ্লানি দূর করিতে সুধাসাধকের মহতী চেষ্টা যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

৬। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের অন্যতমঅধ্যাপক শ্রীতারানাথ ন্যায়তীর্থ এই পুস্তকে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা শ্রদ্ধাশীল জিজ্ঞাসুগণের বিশেষ জ্ঞাতব্য, সুতরাং এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি এবং আশা করি, এই গ্রন্থকার দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া আরও সদ্‌গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবেন।

আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রী৺কামনাদেবী কালীমাতার ও বাবা মৃত্যুঞ্জয় ভৈরবের নিত্যপূজা, নিত্যহোম, নিত্যভোগরাগ, অথিতিসৎকার চতুষ্পাঠি ও বার্ষিক মহোৎসবাদির ব্যয়ভার স্থানীয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের তথা কালীবাড়ীর শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর অযাচিত দানে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু উহা আকাশবৃত্তি কোন সমাজ কল্যাণকর কীর্ত্তির পিছনে স্থায়ী বৃত্তি না থাকিলে, সে কীর্ত্তি বর্ত্তমান যুগে এই আর্থিক বিপর্য্যয়ে দীর্ঘদীন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, ইহার পিছনে একটুকরা সম্পত্তি নাই। তাই আমরা ধর্ম্মোদ্দীপক গ্রন্থগুলি জনকল্যাণকর বহুল প্রচারের দ্বারা একটু সুষ্ঠুভাবে ৺মাতার সেবার ও প্রতিষ্ঠানটীর স্থায়িত্বের চেষ্টা পাইতেছি এবিষয়ে ধর্ম্মপ্রবণ জনসাধারণের প্রয়োজনবিনিময়ে গ্রাহকরূপে সশ্রদ্ধ সহানুভুতি কামনা করিতেছি।

ঠিকানা :—কার্য্যাদক্ষ শ্রীব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য্য কলিকাতা
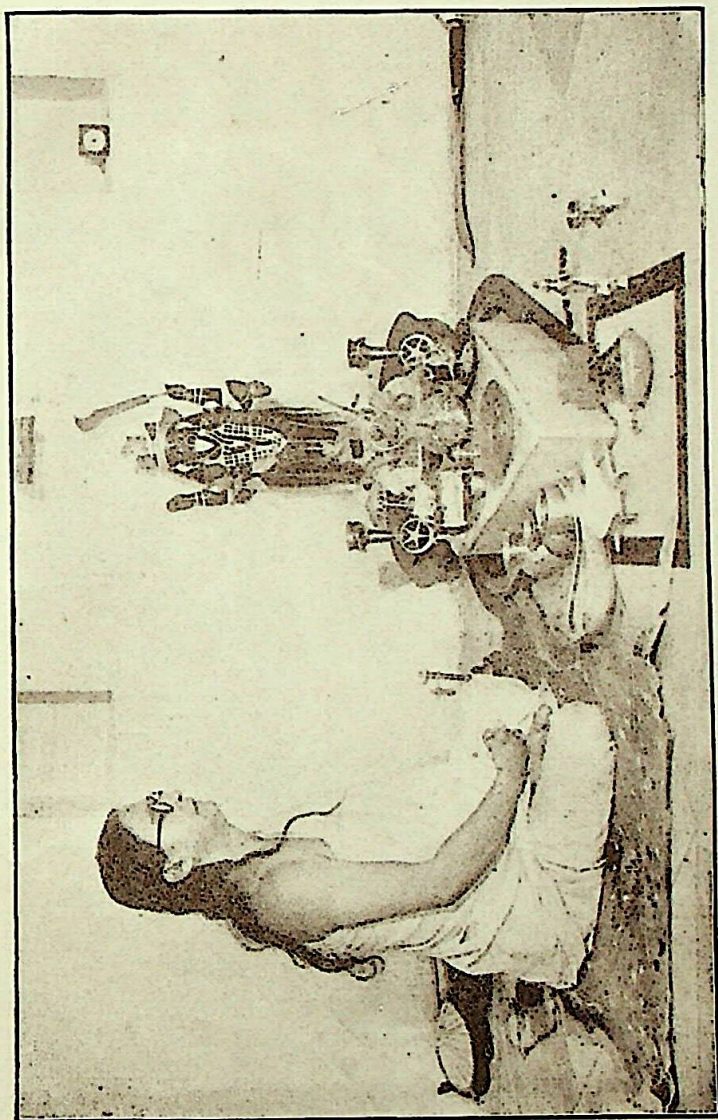
জামসেদপুরের শ্রীশ্রী৺কামনাদেবী
কালীমাতা ও সেবায়েৎ।

সাধন-সোপান।

ঈশ্বর-উপাসনা।

ঈশ্বরকে কেন উপাসনা করিব, তাঁকে ভজনা করিলে কি লাভ হয়, ভজনা না করিলে কি ক্ষতি হয় আমি যা পাচ্ছি তাঁকে ডাক্‌লে যদি বেশী কিছু পাওয়া যায়, আমি বিপদে পড়েছি, তাঁকে ভজনা কর্‌লে তিনি যদি বিপদ্ থেকে উদ্ধার করে দেন, তবেই তাঁকে উপাসনা করার সার্থকতা আছে—এইরূপ প্রশ্ন ঈশ্বরবিমুখ ক্ষুদ্র জীবের মধ্যে দেখা যায়

বেশ দিনগুলি চ'লে যাচ্ছে,—আহার, নিদ্রা, ভ্রমণ, আমোদ-প্রমোদ, কৌতুক, মৈথুন প্রভৃতি কোন ব্যাপারেই বাধা পড়ছে না, হেঁসে খেলে দিন কাটছে—এর মধ্যে ঈশ্বরোপাসনার কি প্রয়োজন, কি সার্থকতা আছে—ভোগবিলাসী জীবের মধ্যে এ প্রশ্নেরও উদয় হয়।

আমি বলি,—ঈশ্বরবিমুখ ক্ষুদ্রস্বার্থজীব! ওগো ভোগবিলাসিজীব, তোমাদের প্রশ্ন সম্পূর্ণ সমীচীন, একান্ত যৌক্তিক। বর্ত্তমানে তোমাদের ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজন নাই। যেমন চলেছ, চল্‌তে থাক। ঈশ্বর বহু দূরে, অতি দূরে, নিকটে, অতি নিকটে, থাকুন, না থাকুন, তোমাদের তাতে কিছু যায় আসে না। যে দিন প্রয়োজন হবে, তোমরা নিশ্চয়ই ডাক্‌বে—

কাহারও উপদেশে নয়, কাহারও অনুরোধে উপরোধে নয়— আপনার গরজেই ডাক্‌বে। ওগো বিনা প্রয়োজনে বিনা স্বার্থে কেহ কিছুই করে না, তোমরাও কর্‌বে না।

বিনা কারণে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, ইহা তো সকলেই জানেন। ঈশ্বরোপাসনারূপকার্য্যের মূলে প্রচুর কারণ আছে। ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্তি, ভাবভক্তি ঈশ্বরের চরণে একান্ত শরণাগতি, ঈশ্বরের সেবায় যথাসর্ব্বস্বদান— ইহাদের মধ্যে একটীও অকারণে সংঘটিত হয় না। অনন্ত ভাবের পেছনে অনন্ত কারণ, আবার অনন্ত কারণের পেছনে স্বয়ং অনন্ত, আর তাঁর অসীম শক্তি প্রবাহ।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে ছোট বড় এমন একটী জীব খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি বিনা স্বার্থে কোন কিছুর অনুষ্ঠান করে থাকেন, যিনি বিনা উদ্দেশ্যে বিনা প্রয়োজনে এক তিল নড়াচড়া করে থাকেন। যাঁর স্বার্থ যত ক্ষুদ্র, তিনি তত স্বার্থপর, তত ঘৃণ্য জীব বলিয়া অভিহিত হন। যাঁর স্বার্থ অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর, তিনি অপেক্ষাকৃত বড়। যাঁর স্বার্থ মহান্‌ তিনি মহাত্মা, আবার যাঁর স্বার্থ অসীমে সমাহিত, তিনি পরমহংস।

সুতরাং যতক্ষণ জীবত্ব, ততক্ষণ "স্ব" এর উপর কিছু না কিছু অর্থ বা প্রয়োজন থাক্‌বেই। যাঁরা নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হন, তাঁরা জীবত্বের উপর উঠে আর ফিরে আসেন না, যাঁরা সবিকল্প সমাধিস্থ তাঁরা ফিরে আসিয়াও জীবত্বের মধ্যে থাকিয়াও জীবন্মুক্ত। জীব একমাত্র ভালবাসে তার স্বার্থকে।

স্ত্রীকে ভালবাসে, পুত্রকে ভালবাসে, বন্ধুকে ভালবাসে, শ্রীগুরুদেবকে, শ্রীমান্ শিষ্যকে ভালবাসে, দেশকে ভালবাসে—ইহার অর্থ অন্য কিছু নয়, ইহার অর্থ—তৎ তৎ বিষয়ক স্বার্থকে ভালবাসা। পূর্ব্বেই বলেছি, জীবের মাপকাঠি যতটুকু তার স্বার্থের মাপকাঠিও ঠিক ততটুকু। তাহা হইলে দেখা যাক্—আমরা স্ত্রীকে ভালবাসি কতটুকু, আমাদের স্ত্রী যতটুকু আমাদের স্বার্থপূরণ করে থাকেন ঠিক ততটুকু, এক চুল বেশী নয়। তিনি যদি আমার স্বার্থের বিরোধী হন, আমারও ভালবাসা তৎক্ষণাৎ পুড়ে ছাই হয়ে উড়ে যাবে ও তিনি তখন হবেন আমার শত্রু। এইরূপ পুত্র, বন্ধু, গুরু, শিষ্য, প্রভু, ভৃত্য সর্ব্বত্র।

যদি প্রশ্ন উঠে,—অজ্ঞান শিশুপুত্র আমার কি স্বার্থসিদ্ধি করে দিচ্ছে, তথাপি আমি তাকে প্রতিপালন করে থাকি, তার রোগশয্যায় বিনিদ্রনয়নে শুশ্রূষা করে থাকি, নিজের সুখ-বোধকে তুচ্ছ করে শিশুর জীবন বাঁচাতে ছুটে চলি—এ শিশুকে আমি নিঃস্বার্থ ভালবাসি।

ওগো অসহায়শিশুর নিঃস্বার্থ জনক! তুমি তোমার বুকে হাত দিয়ে অনুভব ক'রে সত্য ক'রে বল দেখি ঐ অসহায় শিশুকে ভালবেসে তুমি কত আনন্দ পাও, চক্ষের আড়ালে রাখ্‌লে এক পল সহ্য কর্‌তে পার না, বুক থেকে নামালে তুমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠ,—ঐ আনন্দ অনুভবরূপ স্বার্থসিদ্ধিই প্রধান কারণ হয়েছে, ঐ অসহায় শিশুকে তোমার

ভালবাস্‌বার। ঐ নয়নাভিরাম শিশুটীর মৃত্যু হ'লে তুমি যে বুক-ফাটা চীৎকারে পাষাণ ফাটিয়ে দাও—পাগলের মত' ছুটাছুটি কর—এর মূলে আছে তোমার স্বার্থহানি বা আনন্দের অভাব। সুতরাং তুমি তোমার স্বার্থযুক্ত হ'য়েই আনন্দ পাও বলেই পুত্রকে ভালবেসেছিলে। সন্তানকে ভালবাস্‌তে হয় বলে ভালবাস নাই। পুত্রও সন্তান কন্যাও সন্তান—তোমারই শুক্র-শোণিতে দু'এরই উদ্ভব। তবে বল দেখি পুনঃ পুনঃ কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হলে, তোমার অন্তরে ও মুখে বিষাদের ছাপ পড়ে যায় কেন? তোমার কল্পনা—কন্যা অপেক্ষা পুত্র দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি বেশী হয় বেশী আনন্দ পাও। নতুবা ঐ সদ্যপ্রসূতা কন্যা তোমার কোন অপকার করে নাই, করবার সামর্থ্যও নাই, কন্যাপ্রসবিত্রী মাতা,—যিনি তোমার চিরসঙ্গিনী আনন্দদায়িনী, এঁদের উপরও বিরক্ত হও। এখন চোখ বুজে বল দেখি—সত্য সত্য তুমি ভালবাস কাকে? যদি সত্য গোপন না কর—অম্লানবদনে স্বীকার করতে হবে তুমি একমাত্র তোমার স্বার্থকেই ভালবাস। বস্তুবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষকে তুমি কোনদিন ভালতো বাসই না, বরং তারা যদি তোমার স্বার্থ বা আনন্দের অন্তরায় হয়, তবে তুমি তাদের শত্রু মনে করে তৎক্ষণাৎ সে সংসর্গ ত্যাগ কর। আবার কোনদিন যদি তারা তোমার আনন্দের পরিপোষক হয়, তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বের কথা ভুলে গিয়ে বন্ধু বলে তাদের আলিঙ্গন দিয়ে পরমাত্মীয়ের পর্য্যায়ভুক্ত করে নাও। তুমি পরোপকার করতে ছুটেছ

দেশ উদ্ধার কর্‌তে ছুটেছ, তোমার স্বার্থ, তোমার ত্যাগ আদর্শ। কিন্তু তুমি প্রকৃত নিঃস্বার্থ নও। তুমি পরের উপকার সাধন করিয়া নির্য্যাতিত দেশকে উদ্ধার করিয়া আনন্দ, শান্তি, নাম, যশঃ খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং যাহা কিছু প্রার্থিত বস্তু সবই পাও; তাই সন্নাসীর মত ত্যাগের নিশান উড়িয়ে ছুটেছ। তুমি যদি ঐ সব কঠোর কর্ম্মে স্বার্থরূপ আনন্দের সন্ধান না পেতে, তাহা হলে ঐ সব দুঃখ ক্লেশ, কারাবরণ, লাঞ্ছনা নিন্দা, এসব কিছুই সহ্য কর্‌তে পার্‌তে না।

যে দিক্ দিয়েই বিচার করে দেখা যাক, এই অগণিত জীবসঙ্ঘ ছুটেছে নিজ নিজ স্বার্থকে লক্ষ্য করে। বলা বাহুল্য এই স্বার্থের প্রাণশক্তি আনন্দভোগ। চলা ফেরা, উঠা বসা, জাগরণ নিদ্রা, ব্রহ্মচর্য্য মৈথুন, শান্তি বিগ্রহ, শত্রু মিত্র এমন কি শ্বাস প্রশ্বাস যতকিছু কর্ম্মপ্রবাহ অবিরত ছুটেছে, ঐ এক স্বার্থ বা আনন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে।

তা হ'লে এখন দেখা যাচ্ছে—ঈশ্বরকেও ভজনা করবার মূলে প্রচুর স্বার্থ। যদি তাঁকে ভজনা না করে, তোমার দিনগুলি হেসে খেলে চ'লে যায়, তোমার স্বার্থহানি না ঘটে, তোমার আনন্দভোগে বাধা উপস্থিত না হয়, তবে যুগ যুগান্তর ধরে কেউ উপদেশ দিলেও, কেউ পায়ে ধরে কাঁদলেও তুমি ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হবে না। ঈশ্বর-বিমুখ-ক্ষুদ্রস্বার্থ ভোগ-বিলাসী জীব, যদি কোন দিন দেখে, তারই মত একজন জীব

দুর্গা কালী, শিব বিষ্ণু কি অন্য দেবতাকে আরাধনা ক'রে অথবা কোন গাছতলা, নদীর গাভা, মাটির ঢিবিতে মাথা কুটিয়া কিছু সুবিধা করেছে, হয়ত চাকরী বা ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করেছে, হয়ত পুত্রার্থীর পুত্র হয়েছে, হয়ত চিকিৎসকের পরিত্যক্ত রোগী নিরাময় হয়েছে, তখনই ঐ জীব আশান্বিত হয়ে তার ও সেই সেই অসুবিধা দূর করবার জন্য সেই সেই বিষয়ক স্বার্থপূরণের জন্য, সেই সেই দেবতার দিকে ছুটিয়া যাইবে এবং উপসনায় রত হইবে। যদি ঈশ্বর-কৃপায় ঐ ব্যক্তি কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে, তখন তাহার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইবে, অনুরাগ আরও বৃদ্ধি পাইবে। ঈশ্বরের আরাধনার প্রাচুর্য্য আরও বাড়িয়ে দিয়ে আরও অধিকতর লাভবান্ হইবার চেষ্টা করবে। এই ভাবে জন্ম-জন্মান্তরের ব্যবসায়বুদ্ধির ভিতর দিয়া ঈশ্বরোপাসনায় ক্রম-বিবর্দ্ধমান বিশ্বাস ঐ জীবের সঞ্চিত হ'তে থাকে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হতেও থাকে। তাহার ফলে ঐ জীব কত জন্ম পরে প্রার্থিত বিষয়সম্ভোগজনিত আনন্দ ও ঈশ্বরসম্পর্কীয় অনাবিল আনন্দের পার্থক্য উপলব্ধি করার সামর্থ্য অর্জ্জন করে। এই স্থানে উপস্থিত হ'য়ে ঐ কাম্য-ফলাভিসন্ধি জীব যখনই সাধনবলে বুঝতে পারে বিষয়-সম্ভোগ-জনিত আনন্দ অপেক্ষা ঈশ্বরসম্পর্কীয় অনাবিল আনন্দ অনেক উচ্চাঙ্গের নিত্য অবিনাশী ও অসীম, তখনই অধিকতর স্বার্থসিদ্ধির জন্য পূর্ব্বোক্ত বিষয়মুখী স্বল্পকালস্থায়ী

খণ্ড খণ্ড আনন্দকে পরিত্যাগ কর্তে সমর্থ হয়। বিষয়মুখী জীব সাধন-সোপানের শেষ ধাপে যে দিন আরোহণ কর্তে সমর্থ হয়েন, সেই দিনই ঐ চির অবিনাশী অখণ্ড অনাবিল আনন্দের পূর্ণ আস্বাদ উপলব্ধি কর্বেন। তার পূর্ব্বে তাঁকে একেবারে বিষয়ানন্দ ত্যাগ কর্তে উপদেশ দেওয়া বৃথা। জীব এক পল স্বার্থশূন্য হয়ে বাঁচতে পারে না। অধিকতর স্বার্থ বা আনন্দলাভের জন্য জীব সর্ব্বদাই ছুটেছে। চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, তারা, জগৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আনন্দমুখী হয়ে সবাই ছুটেছে, কেহই স্থির নয়। ঐ দেখ ভিখারী ছুটেছে এক মুষ্টি অন্নের জন্য, নদী ছুটেছে সমুদ্রের সহিত আলিঙ্গনের জন্য, অণু-পরমাণু ছুটেছে সংযোগ বা মিথুনের জন্য, সাধক ছুটেছে সাধন-সোপানে, আর ভোগী ছুটেছে ভোগের সন্ধানে।

জীব নিজশক্তির দ্বারা যতক্ষণ স্বার্থসিদ্ধি কর্তে সমর্থ হয় ততক্ষণ সে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করে না। আবার অন্যের সাহায্য দ্বারাও যখন স্বার্থসিদ্ধি অসম্ভব হয়, তখনই সে নিরুপায় হয়ে অসাধারণ শক্তিমান্ ঈশ্বরের সাহায্য-গ্রহণে বাধ্য হয়ে প্রার্থী হয়। বেশ্ হেঁসে খেলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা চলে যাচ্ছে। এ অবস্থায় পূর্ব্বজন্মের সংস্কার না থাক্‌লে, কাউকে বড় একটা ঈশ্বরমুখী হ'তে দেখা যায় না। বরং এই প্রকারের জীব অন্য কাউকে ঈশ্বরমুখী হ'তে দেখ্‌লে, ঠাট্টা তামাসা উপহাস করে থাকে, দারুণ গাত্রদাহে কেহ বা অকথা কুকথাও ব'লে বসে। কিন্তু যখন ঐ ভোগবিলাসী

জীবের মাথায় হঠাৎ বিভীষিকার ছায়াপাত হয়, শোক-দারিদ্র্যরূপ অশান্তি ক্রমে তার বিলাসের নিদ্রা ভাঙ্গিয়ে দেয়, অহমিকার রঙীন সূতায় কাম্যকুসুমে অতি যত্নের গাঁথামালা যখন ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সে একান্ত নিরুপায় হ'য়ে ঈশ্বরমুখী না হয়ে পারে না। কিন্তু যদি দেখা যায় সামান্য দিনের মধ্যে সে সাম্‌লে নিয়েছে, শোকের তীব্র যাতনা কতকটা প্রশমিত হয়েছে, দারিদ্র্যের নির্ম্মম নিষ্পেষণ শ্লথ হয়েছে, ছড়ান ফুলগুলি গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে আবার অহমিকার রঙীন সূতায় জোড়া দিয়ে মালা গেঁথে ফেলেছে, গলায়ও পরে ফেলেছে, তখন সে আবার ঈশ্বরকে ভুলে যায়। কারণ সে অনভ্যস্ত ঈশ্বরমুখী ভাবে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। নিরুপায় হয়েছিল ব'লেই ত সে তার পূর্ব্বপথ ছেড়ে নূতনের সন্ধানে ছুটে এসেছিল। এখন সে উপায় পেয়েছে—কাজেই তার চিরাভ্যস্ত ঈশ্বর-বিমুখ পথে ফিরে যাবেই'ত ইহা'ত স্বার্থের স্বাভাবিক গতি।

কিন্তু আবার যখন সেই জীব বিপদে পড়্‌বে, চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখ্‌বে, পায়ের তলা দিয়ে পৃথিবী স'রে যাবে, তার যত্নে গড়া সেই ফুলের মালা এবার যখন শুকিয়ে যাবে—প্রিয়তম পুত্রকন্যা বা প্রাণপ্রতিমা সঙ্গিনী মৃত্যুশয্যায়, চিকিৎসক হতাশপ্রায়, বিষয়-বৈভব, মামলা মোকদ্দমায় যায় যায়, একান্ত নিরুপায়—কোন জীবের শক্তি নাই যে তাকে সেই বিপদ্ থেকে রক্ষা করতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোন বিনিময়

বস্তু নাই, যার বিনিময়ে তাদের ফিরিয়ে আনা যেতে পারে,—তখনই জীব পুনরায় ঈশ্বরের চরণে 'নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ' বলে আছ্‌ড়ে পড়্‌বে। এইভাবে সেই জীব কত জন্ম পুনঃ পুনঃ আছাড় খেতে থাক্‌বে, তার পর ময়লা মাটি কেটে গিয়ে দ্বিধাশূন্য বিশ্বাসের অধিকারী হবে। তার পর সেই জীব সংস্কারবশে ক্রমবিকাশের পথে ঈশ্বরবিষয়ক তত্ত্বজিজ্ঞাসু হবে; হয়ত ধনীর দুলাল হয়ে জন্মে ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রে ঈশ্বর প্রেমে উন্মত্ত হবে। এইভাবে ক্রমবিবর্দ্ধমান সুসংস্কৃত সেই জীব এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন, কত লোককে জ্ঞান বিতরণ কর্‌বেন, শেষে অশেষে মিশে যাবেন—ইহাই জীবত্বের পরিণতি।

এমন অনেক জীব আছেন, যিনি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পথের ভিখারী, স্ত্রী-পুত্র কিংবা আত্মীয়স্বজনের বিয়োগব্যথায় অধীর উন্মত্ত, তথাপি ঈশ্বরের নাম মুখে আনেন না, বা তাঁর চরণে শরণাপন্ন হয়ে কিছুই প্রার্থনা করেন না, দেবদ্বারে মস্তক অবনত করেন না, প্রসাদ চরণামৃতের ধার ধারেন না—এসব ব্যাপারকে দুর্ব্বলতার লক্ষণ বলেন, অথচ তাঁদের অনেক বিষয়েই প্রচুর দৌর্ব্বল্য আছে, এসব জীবকে কি নাস্তিক বলা চলে, ইহাদের গতি কিরূপ হইবে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ইহারা নাস্তিক নহেন; ঈশ্বরকে মানেন না বা একটুও বিশ্বাস রাখেন না বলে, যে বাহাদুরী দেখান, তাহাও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কারণ তাঁরা নিজ নিজ অস্তিত্বের উপর

সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে মনোবৃত্তি বশে রাখতে পারেন না, কাজেই নাস্তিক হওয়ার লক্ষণ তাঁদের মধ্যে মোটেই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠে না। যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তিনিই প্রকৃত নাস্তিক। ঈশ্বর মানেন না বলে যাঁরা বাহাদুরী করে থাকেন, তাঁরা নিজ নিজ সীমাবদ্ধ শক্তি দ্বারা বা পুরুষাকার দ্বারা যতটুকু সম্ভব কার্য্য সম্পন্ন করেন, কিন্তু সবটুকু সম্পন্ন কোন দিনই করতে পারেন না, সবটুকু ইচ্ছা কোন দিনই তাঁদের পূর্ণ হয় না, অবশ্য কাহারও হয় না, বাকি অসম্পন্ন কর্ম্মের সাফল্যের জন্য অপরে যেমন ঈশ্বরমুখী হন, ঐসব জীব তাহা হন না বটে, কিন্তু পুরুষাকার দ্বারা হওয়া অসম্ভব জেনেও মনে মনে উহার পরিপূরণের বাসনা পোষণ করেন। যখন নিজকর্তৃত্বে বা পুরুষাকারে সফল হবার আশা নাই তখন কার উপর ভরসা করে উহার সাফল্যের ইচ্ছা পোষণ করেন? ঐ সব জীব মুখে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করছেন না বটে, কিন্তু নিজের শক্তি নাই, পুরুষকারও নাই অথচ ঐ সব ইচ্ছা অভিলাষ বাসনাকামনার পরিপূরণের জন্য কাকে লক্ষ্য করে ইচ্ছা করেন? ঐ অজ্ঞেয়-শক্তি ঈশ্বর; তিনি তাঁর মধ্যে রয়েছেন, তিনি তাঁর ইচ্ছা-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে দিচ্ছেন, তাঁর উপর লক্ষ্য করেই ঐ সব বাসনাপরিপূরণের ভাব উদিত হচ্ছে। মুখে তিনি নাম নাই গ্রহণ করুন, সাধারণের মত দেববিগ্রহের চরণে মস্তক নাই নত করুন, তাঁহার পুরুষাকারের বহু ঊর্দ্ধে কোন

অজ্ঞেয়শক্তির উপর নির্ভর করেই তিনি তাঁর আরব্ধ কর্ম্মের পরিপূরণের অভিলাষ প্রতিমূহূর্ত্তেই করে থাকেন। অজ্ঞাতসারে স্বাভিলাষ পূরণের বাসনার জন্য তিনি সেই অজ্ঞেয়শক্তিমানের চরণেই নীরবে মাথা নত করেছেন।

হয়ত তিনি পূর্ব্বজন্মে এই গোপন সাধনা চেয়েছিলেন, তাই সংস্কারবশে বাহিরের নাম ও মূর্ত্তিতে এত বীতস্পৃহ। অথবা তিনি পূর্ব্বজন্মের তথাকথিত ঈশ্বরবিমুখ জীব। আসুরিক দম্ভের আবেষ্টনীতে নিজেকে এমন আড়ষ্ট করে রেখেছেন, এখনও কত জন্ম কেটে যাবে ঐ আবেষ্টনী নষ্ট হ'তে। তারপর তিনি বাহিরে ছুটে আস্‌বেন—সরস প্রেমিক, ঈশ্বরভক্ত প্রাণবান্ হ'য়ে।

তা' হ'লে দেখা যাচ্ছে—বিনা প্রয়োজনে কেউ ঈশ্বরকে ভজনা করেন না। কেউ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিপীড়িত হ'য়ে, কেউ শোকে তাপে দুঃখে কষ্টে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হ'য়ে রক্ষা পাবার জন্য সান্ত্বনালাভের কামনায় ঈশ্বরকে উপাসনা করে থাকেন। কেউ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুসংস্কারবশে বিশুদ্ধ ভক্তিভাবে আত্মতৃপ্তির জন্য আত্মোন্নতির জন্য, কেউ বা বিভূতিলাভের কামনায় সিদ্ধিলাভের জন্য আবার কেউ বা ঈশ্বরভক্তি দ্বারা যশঃ-খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভের কামনায় ঈশ্বরকে ভজনা করে থাকেন। আবার কেউ বা গৈরিক বা রক্তিমাভ বস্ত্র পরিধান করে, শিরোপরি সুদীর্ঘ জটা প্রভৃতি রেখে বিস্ময়কর হাবহাওয়ার সৃষ্টি করে সাধারণকে প্রতারণা করে লোক-দেখান

ঈশ্বরোপাসনাও করে থাকেন। আবার কেউ বা বহু জন্মের তপস্যার ফলে শ্রদ্ধাবান্ হ'য়েই জন্মগ্রহণ করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন, জ্ঞানী হন, শেষে পরমহংসত্বে উপনীত হ'য়ে অখণ্ড পরমানন্দের কারণ-শরীরে বিলীন হন। এইরূপ অগণিত রুচিসম্পন্ন জীব কত ভাবেই ঈশ্বরকে উপাসনা করে থাকেন।

বিনা প্রয়োজনে যখন কেউ ঈশ্বরের উপাসনা করেন না ইহাই সিদ্ধান্ত হইল, তখন ঈশ্বরোপাসকগণকে স্থূলভাবে একটীমাত্র শ্রেণীতে রাখা গেলেও, একটু সূক্ষ্মভাবে ইহাদিগকে সকাম, নিষ্কাম ও মিথ্যাচারভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। বিপদে পড়িয়া রক্ষালাভের জন্য, স্ত্রীপুত্রবিষয়-বৈভবাদিলাভের কামনায় সিদ্ধ্যদ্ধিবিভূতিলাভের বাসনায় সায়ুজ্যসালোক্যলাভের জন্য, ঈশ্বরের প্রীতিলাভার্থ মুক্তিমোক্ষস্বর্গাদিপ্রাপ্তিহেতু, নিত্যশুদ্ধজ্ঞানলাভের জন্য যে ঈশ্বরের উপাসনা—তাহাই সকাম। এই সকাম উপাসনা নিষ্কামে পরিণত হবে তখন, যখন সাধক ইহাদের অসাফল্য জনিত বেদনা অনুভব না কর্‌বেন। যে কোন কার্য্যই করা হউক না কেন,—তা' বিষয়-সম্ভোগের জন্যই হউক বা ঈশ্বর-প্রীতির জন্যই হউক, উহার মূলে ইচ্ছা বা কামনা আছেই। ইচ্ছাশূন্য হ'লেই আর কর্ম্ম বা সাধনা থাকে না। বিষয়-সম্ভোগবাসনা ও ঈশ্বরপ্রীতিকামনা, তত্ত্বের দিক্ দিয়ে বিচার কর্‌লে উভয়ের মধ্যেই ঐ এক ইচ্ছাশক্তি অনুস্যূত হ'য়েই রয়েছে। বিষয়ভেদে ঐ কামনা বহুরূপ ধারণ করেই আছে।

বিষয়-সম্ভোগবাসনা অধম, কারণ উহা অনেকক্ষেত্রেই বন্ধনের কারণ হ'য়ে থাকে। ঈশ্বরপ্রীতিকামনা—উত্তম ইহা মুক্তির কারণ হয়। ঈশ্বরপ্রীতিকামনাকে পারিভাষিক নিষ্কাম বা নিঃস্বার্থ উপাসনা বলা হ'লেও উহাতে ঈষৎ কাম ঈষৎ স্বার্থের প্রভাব থাক্‌বেই। ঈষদর্থেই ঐ সকল স্থলে নঞ্‌ এর প্রয়োগ। বাসনা কামনা একেবারে পরিশূন্য হ'য়ে কোন কর্ম্ম বা কোন সাধনার উৎপত্তি হয় না। বাসনা কামনা বন্ধনের কারণ হ'তেই পারে না, তা হলে জগতের সমুদয় কর্ম্মপ্রবাহই বন্ধনের কারণ হ'য়ে পড়ে। তবে বাসনা কামনার অসাফল্যজনিত যে বেদনা তাহাই বন্ধনের কারণ। পুত্র মানুষ করা কি বন্ধনের কারণ হ'তে পারে, মুনি ঋষিরা অনেকেই পুত্র উৎপন্ন কর্‌তেন, প্রতিপালন কর্‌তেন, কিন্তু মুক্ত ছিলেন। বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতি শতপুত্রের মৃত্যুসংবাদেও অবিচলিত ছিলেন। পুত্র যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয় বা দুর্ব্যবহার করে এবং তাহার জন্য দুঃখ বেদনা যদি পিতার মনে জাগে তবে পুত্রপ্রতিপালন বন্ধনের কারণ হবে, নতুবা নহে, এইরূপ সর্ব্বত্র। যাঁহার মনে বাসনা-কামনার অপূরণজনিত বেদনা অনুভূত হয় না তিনি নিষ্কাম কর্ম্মী আর ঐরূপ উপাসনাই নিষ্কাম উপাসনা।

ঈশ্বরের সহিত আন্তরিক সম্পর্ক না রাখিয়া মাত্র বাহ্য আড়ম্বরের দ্বারা কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নিজেকে ধার্ম্মিক ভক্তরূপে প্রতিপন্ন করিবার যে পদ্ধতি, তাহাই মিথ্যাচার অথবা যে সমস্ত অনুষ্ঠান সত্য নহে তাহাই মিথ্যাচার।

কর্ম্মেন্দ্রিয়য়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ইতি গীতা ।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিজ হস্তে পাপানুষ্ঠান না করিয়াও উৎসাহ-প্ররোচনাদি দ্বারা পারম্পর্য্য-সম্বন্ধে পাপ কার্য্যের সাহায্য করিলেও যেমন পাপের ফলভাগ গ্রহণ করিতে হয়, পুণ্যানুষ্ঠানে সেইরূপ হইয়া থাকে। মিথ্যাচারী নিজে ভণ্ড হইলেও, বহু লোককে পূণ্যকর্ম্মে সাহায্য করিয়া থাকে ও উৎসাহ-প্ররোচনাদি দ্বারা বহুলোককে সৎকর্ম্মেই অনুবর্ত্তিত করিয়া থাকে। এই পূণ্যফলে, এই সৎকর্ম্মের সংসর্গে একদিন ঐ আত্মপ্রবঞ্চনা বা ভণ্ডামিরূপ মহাপাপ থেকে মুক্ত হ'য়ে মিথ্যাচারী সত্যের জ্যোতির্ম্ময় দ্বারে উপনীত হবেই। একেবারেই ঈশ্বরবিমুখ হওয়া অপেক্ষা এই মিথ্যাচার কতকাংশে আশাপ্রদ। তৈলভাণ্ড নিজে তৈলের আস্বাদ গ্রহণ না করিলেও সে তৈলসিক্ত হ'য়ে নিজে পেকে যাচ্ছে, উহাতেও তার স্থায়িত্বের দিক্ দিয়ে একটা সার্থকতা আছে।

অনেক উপাসনাবিমুখ জীব বলে থাকেন—যে দিন সত্য সত্য ঈশ্বরকে ডাক্‌তে পার্‌ব সেই দিন ধর্ম্মকর্ম্ম করা যাবে, এইরূপ মিথ্যাচারী হওয়া অপেক্ষা আমরা বেশ আছি। আমি বলি—ওগো সত্যপ্রিয় জীব! একটু চিন্তাশীল হ'লেই দেখ্‌তে পাবে পূর্ণজ্ঞানলাভের বা নির্ব্বাণলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ, পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ বিপর্য্যয় জ্ঞান তিরোহিত না হচ্ছে,—যিনি যত বড় উগ্রসাধক বা সত্যপ্রিয় হউন, ঈশ্বারোপাসনায়

কিছু না কিছু মিথ্যাচার থাক্‌বেই। ঈশ্বরের উপাসনায় জপ ধ্যান পূজা হোম স্তব কবচ বহুদিন ধরে অভ্যাস কর্‌তে হয়। যে দিন যে মুহূর্ত্তে জপাদিক্রিয়াগুলি সত্য সত্য অনুষ্ঠিত হবে, তারপরই উহার আর প্রয়োজন থাক্‌বে না। প্রকৃত পূজা যতক্ষণ না হচ্ছে, মিথ্যাচারের বহু ঊর্দ্ধে সত্যের পাদপীঠে যতক্ষণ উপনীত হওয়া না হচ্ছে, ততক্ষণ জপপূজাদি প্রত্যহই চলতে থাকে। পূজাশেষে প্রত্যহ আত্ম-সমর্পণ করারও ব্যবস্থা আছে। একদিন আত্মা সমর্পিত হ'লে পরদিন কি আর তার প্রয়োজন থাকে? ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? প্রথম দিন আত্মা ঠিক ঠিক সমর্পিত হয় না বলেই পরদিন উহার অভ্যাসকল্পে আবার আত্ম-সমর্পণ কর্‌তে হয়। একদিন একটা যোগবিশেষে বৈধ গঙ্গাস্নান কর্‌লে—স্নানকারীর পূর্ব্বাপর ত্রিকোটিকুল উদ্ধার হয়ে যায়। তারপর ঐ ব্যক্তির বৈধগঙ্গা-স্নানে আর কি প্রয়োজন থাকে? সুতরাং যতদিন জপধ্যান পূজাদি সত্য সত্য অনুষ্ঠিত না হচ্ছে—পূর্ণানন্দের সন্ধান না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন কিছু না কিছু মিথ্যাচার চলতেই থাক্‌বে। একেবারে খাঁটি সোনা যেদিন হবে, সেদিন আর শব্দ পাওয়া যাবে না, তার পূর্ব্বে কিছু না কিছু খাদ থাক্‌বেই। আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, প্রথম বিদ্যার্থীকে 'ক' 'খ' লিখতে হাঁড়ী কলসী লিখতে দেখে যেমন উপহাস বা তাচ্ছিল্য করেন না তেমনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানীব্যক্তি মিথ্যাচারী উপাসককে দেখে অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য করেন না,—বরং দয়া করে সদুপদেশ

দিয়ে দেন। বিশ্বপ্রকৃতিতে যেমন ক্রমবিকাশ, আধ্যাত্মিক জগতেও ঠিক তাই। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণভেদে ও গুণের পরিমাণভেদে এই ত্রিবিধ উপাসক অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে আছেন। (সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃস্মৃতম্)।

গুরুকরণ।

ভূপৃষ্ঠে বীজ পতিত হলে, আপনা আপনি অনেক গাছ জন্মায়; কতকগুলি নষ্টও হয়, ফলপ্রসূ হ'তে সময়ও অনেক লাগে আবার অনেক গাছ ফলপ্রসূও হয় না—কিন্তু উহাদিগকে শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্ত্তিতার আবাদের মধ্যে নিয়ে আন্‌তে পারলে, বীজ প্রায়ই নষ্ট হয় না, সত্বর ফললাভ হয় এবং প্রচুর ফলও জন্মায়। ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে ঈশ্বরের উপাসনার প্রবৃত্তি যে কোন শ্রেণীর প্রয়োজনের অনুসারে আসুক না কেন, তাহা যদি নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যে আনা যায়, তা অতি সত্বর ফলপ্রসূ হয়। বিশ্বমাতৃকার গর্ভে স্রষ্টার বীজ যেমন ভাবে ক্রমবিকাশের আবহাওয়ার পরিণতি লাভ করে আধ্যাত্মিক সুপ্ত চিত্তের পরিণতিও ঠিক সেই ভাবেই গড়ে উঠে।

আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হবার নিয়মানুবর্ত্তিতার পক্ষে আর্য্যতাপসগণ অগণিত বিধিনিষেধ প্রণয়ন করে গেছেন; ইহাদের মধ্যে প্রাথমিক বিধি গুরুকরণ ব্যতীত ঈশ্বরের উপাসনা যে ফলপ্রসূ হয় না, গুরুর কৃপা ব্যতীত সাধন সোপানে যে একপদ অগ্রসর হওয়া যায় না, সাধন-সোপানের প্রতি পদক্ষেপ দেখিয়ে দেন একমাত্র পরমগুরু নামময় শ্রীগুরুদেব—ইহার অগণিত প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে, বেদে তন্ত্রে উপনিষদে, পুরাণে এবং ব্যবহারিক জগতে। অদ্যাপি মস্তিষ্ক বুদ্ধি দ্বারা কেহ ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি ক'রতে পারেন নাই, উহা সাধনাসাপেক্ষ, ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে সাধন সোপানের প্রতি ধাপে আরোহণ ক'রতে হয়। অনুভূতির দ্বারা যাহা উপলব্ধি করতে হয়—মস্তিষ্কবুদ্ধি দিয়ে তা কিরূপে সম্ভব? তোমার কাণে কেউ একটু চিনি ফেলে দিলে তুমি কি তার আস্বাদ বুঝতে পার? আবার কোন্ জিনিষের কি আস্বাদ, যতক্ষণ জিহ্বার সহিত সংযোগ করা না হয়, ততক্ষণ বহু সুললিত ভাষা গভীর পাণ্ডিতা ও অকাট্য যুক্তি দিয়ে কেউ কি তার প্রকৃত আস্বাদ বুঝিয়ে দিতে পারে? মস্তিষ্কবুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরকে বুঝতে যাওয়াও ঠিক তদ্রূপ।

শ্রীগুরুর নিকট দীক্ষিত না হ'য়ে পুস্তকাদি দর্শন করিয়া স্বেচ্ছামত একটা মন্ত্র ঠিক করিয়া লইয়া শতলক্ষ জপ করলেও প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি বা শক্তিলাভ হ'বে না। এ বিষয় "রুদ্রযামল" তন্ত্রে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে।

যথা—গুরুং বিনা যস্তু মূঢ়ঃ পুস্তকাদিবিলোকনাৎ জপবন্ধং সমাপ্নোতি কিল্বিষং, পরমেশ্বরি। সুতরাং সাধনসোপানে উঠতে হ'লে গুরুকরণ একান্ত প্রয়োজনীয়।

অনেকে বলেন শুদ্ধমনে একপ্রাণে ঈশ্বরকে ডাক্‌বে, কারও অপকার অনিষ্ট চিন্তা কর না, ইহাতেই ঈশ্বর প্রসন্ন হবেন, ইহার মধ্যে কেন আমার মতই রক্তমাংসশরীর একজনকে ডেকে এনে গুরু কর্'র? ইহার উত্তরে বলা যায় ঈশ্বর সর্ব্বাদই সকলের উপরই প্রসন্ন। জীবসঙ্ঘ যখন নিজেরা অপ্রসন্ন থাকেন ঈশ্বরকেও অপ্রসন্ন দেখেন। নিজেরা যখন প্রসন্ন থা'কেন তখন ঈশ্বরকেও প্রসন্ন দেখেন। তুমি এখন শুদ্ধমনে আছ কাজেই ঈশ্বরকে প্রসন্ন দেখ ছ। কিন্তু তোমার এ প্রসন্নতা বেশীক্ষণ থাকে না, একটা বিভীষিকা দেখ্‌লেই, একটী ধাক্কা খেলেই আবার সব এলোমেলো হ'য়ে যাবে, সব বিশৃঙ্খল হ'য়ে যাবে, তুমি আর শুদ্ধমনে ডাক্‌তে পারবে না—তোমার ঈশ্বরকে আর প্রসন্ন দেখবে না! ইহার কারণ কি—একটু চিন্তা করে দেখ, তুমি যে শুদ্ধমনে ঈশ্বরকে ডেকেছিলে, উহা ঠিক শুদ্ধমন নয়, ব্যবহারিণী বুদ্ধি দ্বারা মনটার উপর সাফা করেছিল মাত্র। সুপ্তচিচ্ছক্তিতে সমাচ্ছন্ন তোমার মনের যে ভিতর অংশ, তা সাফা করবার শক্তি তোমার ছিল না, থাকেও না। সুপ্তচিড্ডিম্ব অন্যের সাহায্য না পেলে আপনা হতে ফোটে না। কাজেই বিভীষিকার তাল সাম্‌লাতে পার্‌লে না। মনের ভিতরটী

পরিশুদ্ধ কর্‌তে হলে, তোমার মনোবৃত্তিতে যে সুপ্তচিচ্ছক্তি আছে, অন্য কোন শক্তিমান্ সাধকের শক্তিসঞ্চালন দ্বারা জাগিয়ে নিতে হবে। তুমি নিজে নিদ্রিত হলে, কোন একটা ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিজে হ'তে জাগ্‌তে পার না। তোমার মন যদি সুপ্তচিচ্ছক্তিতে আচ্ছন্ন থাকে, তুমিও আচ্ছন্ন আছ, একথা অস্বীকার কর্‌তে পার না। তুমি যে মস্তিষ্কবুদ্ধি দিয়া গুরুকরণ বাদ উড়িয়ে দিতে চাহ, উহা তোমার নিদ্রিত চিচ্ছক্তি-সমাচ্ছন্ন মনোবৃত্তির অন্যতম বিকার।

জীব যখন ডিম্ব মধ্যে থাকে, তখন সে মাতৃগর্ভ হতে প্রসূত হয়েও অচিৎ থাকে, অরূপ থাকে। আমরাও ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এতদিন এইরূপই ছিলাম। ক্রমশঃ মনন, দর্শন, স্পর্শন, সঞ্চালন দ্বারা বিশেষিত হয়ে ডিম্ব মধ্যে হ'তে চৈতন্য ও রূপ লইয়া বাহির হইলাম। ব্যবহারিক বা আধ্যাত্মিক জগতে নিদ্রিতকে জাগাতে হলে, অচিৎকে চিৎ কর্‌তে হলে মনন, দর্শন, স্পর্শন ও শক্তিসঞ্চালন এই চারিটী প্রক্রিকার বিশেষ প্রয়োজন। ব্যবহারিক জগতে ডিম্বজাতীয় জীবের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য কর্‌লে বেশ বুঝতে পারা যায়—ঐ প্রক্রিয়াগুলির কি অপরিসীম শক্তি। মনন অর্থে চিন্তা, দর্শন অর্থে দেখা, স্পর্শন অর্থে ছোঁয়া, শক্তিসঞ্চালন অর্থে একটী গঠনমূলক প্রবাহ। এই চারিটী প্রক্রিয়া দ্বারা সুপ্তচিৎকে জাগিয়ে তোলা যায়, কোন কোন স্থলে এক একটা প্রক্রিয়ার দ্বারাই সুপ্তচিচ্ছক্তিকে জাগান যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা

যায়,—কর্কট কেবল পুনঃ পুনঃ মনন দ্বারাই তাহার প্রসূত ডিমগুলিকে ফুটাইয়া দেয়, মৎস্যজাতীয় জীবগুলি ডিম্ব প্রসব করিয়া পুনঃ পুনঃ দর্শন প্রক্রিয়া দ্বারা তাদের সেই সুপ্তচিড্ডিম্বগুলিকে তাদের স্বরূপ মৎস্যমূর্ত্তিতে পরিণত করে। পক্ষী বা সর্পজাতীয় জীবগুলি পুনঃ পুনঃ স্পর্শন প্রক্রিয়া দ্বারা অর্থাৎ 'তা' দিয়া ডিম্বগুলিকে ফুটাইয়া দেয় এবং স্ব স্ব স্বরূপে পরিণত করে, ঠিক এইরূপ শ্রীগুরুদেব, মনন, দর্শন, স্পর্শন ও শক্তিসঞ্চালন এই চারিটী প্রক্রিয়া দ্বারাই, অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত শিষ্যের মনোমধ্যে যে নিদ্রিত চিচ্ছক্তি আছে, আধ্যাত্মিক ভাষায় যাকে সুপ্তকুলকুণ্ডলিনী বা জ্ঞানকোষ বলে, তাকে জাগিয়ে তোলেন। সুপ্তচিড্ডিম্বের মধ্য থেকে বাহিরে আসিয়াই জীবগণ, নিজেদের স্বরূপ ও স্বভাব বুঝে উঠ্‌তে পারে না, ক্রমবিবর্দ্ধনে স্বরূপ গঠিত হয় এবং স্ব স্ব স্বভাবানুযায়ী চলতে থাকে। সেইরূপ শিষ্যও অনেক ক্ষেত্রে দীক্ষাগ্রহণের পরমুহূর্ত্তেই বুঝতে পারে না— তার স্বরূপ কি হইল। সেও ক্রমবিবর্দ্ধনের পথে শ্রীগুরুদেবের উপদেশে, বুঝতে সমর্থ হয়,—যে সে অমৃতের পুত্র, সে অবিনশ্বর, সে চিরমুক্ত। তখন ব্যবহারিক জগতের বিভীষিকা, বাসনাকামনার অপূরণজনিতবেদনা, সাংসারিক দুর্দ্দৈব, ঐ ধীমান্ সাধককে পূর্ব্বের মত চঞ্চল করতে পারে না। জ্ঞানময় গুরুদেবের সাধন-শোধিত সিদ্ধাত্মার ভিতর থেকে মনন দর্শন স্পর্শন শক্তিসঞ্চালনরূপ প্রক্রিয়াগুলি উপযুক্ত

গুরুভক্ত ধীমান্ শিষ্যের ভিতর প্রভাবিত হ'য়ে সুপ্তকুল-কুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করেছে; তাই তাঁর জ্ঞানকোষ উদ্ভিন্ন হয়েছে, তিনি অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন, অখণ্ড আনন্দের প্রাণমাতান গন্ধ পেয়ে অন্বেষণে ছুটেছেন—তাই সাংসারিক বিশৃঙ্খলা—শোকতাপ, দুঃখদৈন্যকে, মিথ্যা মায়া বা লীলা মনে করে, অভিভূত না হয়ে উড়িয়ে দিতে পেরেছে।

অসংখ্য পুস্তক পাঠ করে, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করে, তুমি যতবড়ই পদস্থ হও না কেন, গাড়ী-বাড়ী, চাক্‌রী জমিদারীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তুমি যতবড়ই ধনী হও না কেন,—তুমি এখনও অতিদীন, অতিদুর্ব্বল, গতিশক্তি-হীন যদি আজও তোমার গুরুকরণ না হয়ে থাকে; তোমার যা শিক্ষা, তোমার যা ঐশ্বর্য্যের প্রভাব, উহা তোমার শোক তাপ বা দুঃখে কোন উপকার দেবে না, তোমার মানসিক বিভীষিকায় অভয় বা সান্ত্বনা দিতে পার্‌বে না। অভয় দিতে পারে একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা, যাহা অধিকৃত হলে, আর অধিকার করবার কিছুই থাক্‌বে না; অভাবের তীব্র যাতনা কোনদিন ভোগ করতে হবে না, পরাজয়ের গ্লানিতে শয্যাশায়ী হতে হবে না। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা,—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" দুর্ব্বল ব্যক্তি আত্মদর্শনে অক্ষম। ব্রহ্মবিদ্যায় বলবান্ হ'য়ে বসুন্ধরা ভোগ কর। আধ্যাত্মিক অনুশীলন দ্বারা প্রকৃত বলবান্ হয়ে তোমার ভোগ্য ঐশ্বর্য্যকে প্রাণময় করে তোল,

তখন ঐশ্বর্য্য তোমাকে আনন্দই দেবে—দুঃখ দেবে না, বিভীষিকা দেখাবে না। যাচিত বিভূতি বেশী দিন থাকে না। আধ্যাত্মিক অনুশীলনের দ্বারা সাধন সোপানে উঠ্‌তে উঠতে আপনা হতে অযাচিত বিভূতি এসে পড়ে তা খরচ করলেও ফুরিয়ে যায় না।

ব্যবহারিক জগতে কোন একটী দ্রব্য গ্রহণ কর্‌তে হলে, প্রথমেই সেই দ্রব্যটীর চিন্তা অর্থাৎ মনন, তারপর দেখা অর্থাৎ দর্শন, তারপর ছোঁয়া অর্থাৎ স্পর্শন, তারপর দ্রব্যটী তুলে নেওয়া অর্থাৎ শক্তিসঞ্চালন ; আধ্যাত্মিক জগতেও ঠিক ঐরূপ। শ্রীগুরুদেব উক্ত চারিটী প্রক্রিয়া দ্বারা শিষ্যকে উদ্বোধিত কর্‌লেন ; ধীমান্ শিষ্যও শ্রীগুরুদেবকে মনন, দর্শন, সেবাদি দ্বারা স্পর্শন এবং অভ্যাসরূপ অনুশীলন অর্থাৎ শক্তিসঞ্চালনরূপ চারিটী উক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা নিজমধ্যে শ্রীগুরুদেবকর্ত্তৃক উদ্বোধিত শক্তিকে জাগিয়ে রাখ্‌বেন। তবেই উহা ফলপ্রসূ হবে। অনেকের ধারণা আছে, শক্তিশালী গুরুদেব আসিয়া শিষ্যের মাথায় হাত দিবেন, শিষ্য উদ্ধার হয়ে যাবেন, শিষ্যকে কিছুই কর্‌তে হবে না,—ইহা ভুল ধারণা। তপ্ত মরুভূমিবক্ষে বীজ ছড়ালে সে বীজ কখনই অঙ্কুরিত হবে না। আবার সরস জমিতে কীটদষ্ট বীজ কখনই ফলপ্রসূ হবে না। গুরুদেবই সব কর্‌বেন—শিষ্য কেবল দীক্ষা গ্রহণ করেই খালাস—ইহা কোথাও কোন যুগে ঘটে নাই। পরমহংসদেবের ন্যায় অবতার বিশেষ

শ্রীগুরুদেব আর কোটি জন্মের কৃততপা বিবেকানন্দের ন্যায় শিষ্য। অনুসন্ধান করিয়া দেখ,—এখানেও স্বামীজিকে কি কঠোর পরিশ্রমে সাধনসোপানে উঠতে হয়েছে। সারারাত্রি রুদ্ধদ্বার কক্ষে স্বামীজি, ধ্যানস্তিমিত নয়ন। প্রস্ফুটিত রক্ত-কমলের মত তাঁর নবীন মুখমণ্ডলে পালে পালে মশকের দল উড়ে এসে বস্‌তে লাগ্‌ল হুল ফুটিয়ে দিয়ে ধ্যান ভাঙতে পার্‌ল না, তারা স্বামীজির সুন্দর মুখখানা ফুলিয়ে দিয়ে চলে গেল,—আর রেখে গেল তার উপর তাদের ব্যর্থপ্রয়াসের কতকগুলি ক্ষতচিহ্ন। এই ভাবে স্বামীজি কত রাত্রি কাটিয়েছেন। তাই স্বামীজি অপূর্ব্ববিভূতি লাভ করে বিশ্বজনসমুদ্রের উচ্ছ্বসিত বক্ষে স্তব্ধমেরুদণ্ডে দাঁড়িয়ে সুপ্ত ভারতের গুপ্ত গরিমা ফুটিয়ে তুলে ঘোষণা কর্‌লেন—আধ্যাত্মিক অনুশীলনে ভারত বিশ্বের শীর্ষস্থানীয়, বরেণ্য এবং গুরুস্থানীয়। যাক্ সে অন্য কথা।

মনন, দর্শন, স্পর্শন ও শক্তিসঞ্চালন প্রক্রিয়াগুলি দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী বা জ্ঞানকোষ যে জাগরিত হয়, বা হ'তে পারে তা একটু ব্যবহারিক বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ কর্‌লেও কতকটা বুঝ্‌তে পারা যায়। তুমি কোন মৃত প্রিয়জনকে মনন কর্‌ছ, সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখমণ্ডলে শোকের কালিমা ঢেলে কে দিয়ে গেল? তুমি বহুকালের পর কোন প্রিয়জনকে দর্শন কর্‌লে তোমার মুখমণ্ডলের স্নায়ুগুলির উপর পুলকের তুলি কে যেন বুলিয়ে দিয়ে গেল। তুমি যুবক, তুমি যুবতী স্পর্শ করেছ,

তোমার সমস্ত দেহে একটা তড়িৎপ্রবাহ কে ছুটিয়ে দিল ? ঠিক এই ভাবে শক্তিমান্ সাধক যিনি তোমার চেয়ে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে আছেন, সাধন-সোপানের অনেক উচ্চস্তরে আরোহণ করেছেন, সেই করুণাময় শ্রীগুরুদেব এরূপ ভাবে শক্তি সঞ্চালন করেন, যাতে তোমার ঐ নিদ্রিত কুলকুণ্ডলিনীর স্নায়ুমণ্ডলীতে একটা জাগর্ত্তির সাড়া আনিয়ে দিতে পারেন । তারপরও শ্রীগুরুদেব মনন দর্শন স্পর্শন দ্বারা উহাকে আরও শক্তিশালী ক'রে তুল্‌তে থাক্‌বেন ; তখন তুমি তোমার সেই অপার্থিব আরাধ্যকে মনন করলে, তাঁকে দর্শন করলে, তোমার মুখমণ্ডলের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর এক অপার্থিব দেবজ্যোতিঃ প্রতিভাত হবে। সে জোতিঃ কেউ অভিনয় দ্বারা অনুকরণ করে এনে দেখাতে পারে না। ওগো আমি জানি,—অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয় অভিনেতাও সে ভাব ফোটাতে না পেরে, তার চরণে মাথা নত করে হার মেনেছে।

একবার মাত্র দীক্ষা গ্রহণ কর্‌লেই শ্রীগুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ চুকে গেল না। মনন, দর্শন, স্পর্শন, শক্তিসঞ্চালন পরম্পরের মধ্যে হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। বোধনের পরই পূজার একান্ত প্রয়োজন, তারপর বিসর্জ্জন। বিসর্জ্জন হ'লে অর্থাৎ আত্মা সমর্পিত হ'লে তখন গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ শেষ হবে, মহাকাশে সব মিশে যাবে। কিন্তু বোধনের পরই যদি বিসর্জ্জন হয়, তা হলে সে বোধনের কি প্রয়োজন ?

গুরু শব্দের একটী তাৎপর্য্যবোধক অর্থও আছে, তাহার দ্বারাও গুরুকরণের সার্থকতা প্রমাণিত হয়। 'গ' কার যিনি সিদ্ধি দেন, 'র'কার যিনি পাপকে দগ্ধ করে নষ্ট করেন, 'উ'কার উভয় স্থানেই স্বয়ং শিব, অর্থাৎ যিনি জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা সমুদয় পাপকে দগ্ধ করে সর্ব্বমঙ্গলময়ভাবে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেন, তিনি গুরু। অথবা যিনি সাধনায় সাফল্য দান করে নিষ্পাপ ক'রে তোলেন এবং জ্ঞানময় অবস্থায় উঠে যেতে সাহায্য করেন, তিনি গুরু। আরও একটা অর্থ হ'তে পারে —'গু' শব্দে অন্ধকার বুঝায়, 'রু' শব্দে তন্নিবারক, সুতরাং যিনি অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট ক'রে জ্ঞানের জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত করেন, তিনিই গুরু।

গুরুকরণের আরও একটা দিক্ আছে,—গুরুকরণ ঠিক ডাক্তারী "ইন্‌জেক্‌শন্"। উহার ফলে আধ্যাত্মিকদেহে অহঙ্কাররূপ বদ্‌রক্তের সূক্ষ্ম কণিকাগুলি ধীরে ধীরে নষ্ট হ'য়ে যায়। অহং ভাবটী জীবকে বিমূঢ় করে তোলে, যত বর্দ্ধিত হ'তে থাকে, তত বিশ্বে অশান্তি এনে দেয়, শেষে মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধ-বিগ্রহ সাথে সাথে এসে দেখা দেয়, তার ফলে শত শত জনপদ ধ্বংস হয়, সহস্র বৎসরের গড়ে তোলা সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়। শ্রীগুরুর অনুশাসনবাক্যে ভয়েই হউক্, ভক্তিতেই হউক্, শিষ্যের মন উচ্ছৃঙ্খলতার পথ থেকে সংযমের সমতল-ভূমিতে ফিরে আসে। গুরুবাক্য পাছে লঙ্ঘিত হয় এই ভয়েও কিছু কিছু কাজ হয়। জমার ঘরে কাণাকড়িও পুঁজি হচ্ছিল

না, তবুও গুরুকরণের পর থেকে শ্রদ্ধায় হোক্ বা অশ্রদ্ধায় হোক্ কিছু কিছু হ'তে সুরু হয়। ঐ যে শ্রীগুরুদেবের দীক্ষা-দানরূপ কর্ণভেদী মর্ম্মস্পর্শী ইন্‌জেকশন্ উহা জন্মার্জ্জিত দুষ্ট বীজাণুকে নষ্ট করতে সাহায্য করে। তাহার ফলে বহু জন্মার্জ্জিত পাপের ধ্বংস হয়। পাপ ক্ষয় না হ'লে জীব প্রকৃত সৌভাগ্যদেবীর দর্শন পায় না। অদীক্ষিত ব্যক্তির নামে সঙ্কল্পিত কাম্য কর্ম্মের তেমন ফল পাওয়া যায় না—ইহা বহুক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ।

যদি বল,—সহস্র সহস্র লোক অদীক্ষিত রয়েছে, তবু ত তারা সৌভাগ্য প্রাসাদের উন্নতশীর্ষে বসে ঐশ্বর্য্য ভোগ করে যাচ্ছে, তবে ব্যবহারিক জগতে দীক্ষার কি প্রয়োজন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়,—"শুচীনাং শ্রীমত্যাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে"। বর্ত্তমানে ঐ সব অদীক্ষিত জীব পূর্ব্বজন্মে কত তপস্যায় রত ছিলেন, তাই সেই পুণ্যফলে আজ সৌভাগ্যদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে ব'সে ভোগদেহের ঐশ্বর্য্য আশা যথাতৃপ্তি উপভোগ করছেন এক কথায় পূর্ব্বজন্মের পুঁজি ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছেন, এ জন্মে ঐশ্বর্য্যের মোহে মুগ্ধ হ'য়ে পূর্ব্বজন্মের সাধন পথ বিস্মৃত হয়েছেন, হয়ত পূর্ব্বের পুঁজি খেতে খেতে চলে যেতেও পারেন, পরজন্মে অতি দীন দরিদ্রের ঘরে জন্ম নিতে পারেন, আবার ইহজন্মেই হঠাৎ পুঁজি ফুরিয়ে গিয়ে দীন দরিদ্র এমন কি পথের কাঙ্গাল হয়েও বেড়াতে পারেন। ওগো, পুণ্যক্ষয় না হ'লে দুঃখ

আসে না, ইহা যে ধ্রুবসত্য। আর এসব ঘটনা ত নিত্যই দেখা যাচ্ছে।

কেউ প্রশ্ন কর্‌তে পারেন—এমন অনেক অদীক্ষিত ব্যক্তি আছেন যিনি চরিত্রে, ব্যবহারে, সৌজন্যে, সমাজকল্যাণে, উদারতায়, মহাপ্রাণতায়, দয়া-দাক্ষিণ্যে অনেক অনেক দীক্ষিত সন্তানের চেয়েও বরেণ্য স্থানে রয়েছেন। এই বরেণ্য ব্যক্তির দীক্ষার কি প্রয়োজন আছে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়,—ঐ সব বরেণ্য ব্যক্তির দীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। ভারতীয় সংস্কৃতির চরম লক্ষ্য কেবল সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবহারিক বিষয়বৈভবই নহে, ইহার বহু উর্দ্ধে আছে,—আত্মোন্নতি, আত্মজ্ঞানোপলব্ধি. উহাই চরম লক্ষ্য। উহা সাধন সাপেক্ষ। বিনা গুরুকরণে, নিজে নিজে ঈশ্বরের উপাসনা করে এ পর্য্যন্ত কেহ সাফল্য লাভ কর্‌তে পারেন নাই। ঋষি-যুগ হইতে অগণিত মহাপুরুষগণের উদ্ভব হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজনের নাম করুন, যিনি বিনা গুরুকরণে আত্ম-জ্ঞান লাভ করেছেন। ঐ সব বরেণ্য মনীষী ব্যক্তি ব্যবহারিক জীবনে যতই উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করুন না কেন, প্রকৃত শান্তি বা বিমলানন্দের সন্ধান পান নাই। যেমন পার্থিব ধনার্জ্জন কর্‌তে হ'লে তদনুকূল নির্দ্দিষ্ট সোপান আছে, সেইরূপ যে ধনে ধনী হ'লে ঐ সব পার্থিব ধনসম্পদ্ অতি তুচ্ছ অতি নগণ্য বলে মনে হয়—সেই ঐশীধন অর্জ্জন কর্‌তে হ'লে তারও তদনুকূল সুনির্দ্দিষ্ট সোপান আছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে

আধ্যাত্মিক অনুশীলনই সাধন-সোপান। সধন-সোপানের প্রথম পাদপীঠ—গুরুকরণ। গুরুকরণ ব্যতীত কর্ম্মজগৎ একেবারেই অচল। ব্যবহারিক জগতে প্রতি. কর্ম্মেই যেমন গুরুর আবশ্যকতা আছে, আধ্যাত্মিক জগতের প্রতিপদক্ষেপেও ঠিক তাই। যিনি ভাল লাঠিয়াল, তাঁর কাছে কত লোক লাঠী খেলা শিখ ছেন ডাকাতের সর্দ্দার তাঁর দলকে ডাকাতি শিখিয়ে থাকেন। যিনি জড়বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, তাঁর শত শত শিষ্য তাঁর চরণতলে বসে বিজ্ঞানের অনুশীলন কর্‌ছেন, যিনি বড় ডাক্তার, যিনি বড় কবিরাজ, যিনি বড় সাহিত্যিক, যিনি বড় কবি, এইরূপ যিনি যে কর্ম্মে বড় এমন কি খানিকটা এগিয়ে আছেন, তাঁদের নিকটে এসে শত শত ছাত্র শিষ্য তদনুকূল শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। ঘরে বসে পুস্তকাদি পাঠ ক'রে যেমন লাঠির পাঁচ শেখা যায় না, অন্যান্য বিদ্যাও আয়ত্ত করা বা সুপণ্ডিত হওয়া সম্ভব হয় না, শিক্ষকসান্নিধ্য লাভের একান্ত আবশ্যকতা হ'য়ে পড়ে, তেমনি আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে উন্নত হ'তে হ'লে পুস্তকাদি পাঠ করে উহাতে অগ্রসর হওয়া যায় না। গুরুকরণ একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। যিনি বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানে উন্নত হ'তে চান, পাশ্চাত্যজগতের জড়বিজ্ঞান-মনীষীর চরণপ্রান্তে উপনীত হউন আর যিনি আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে উন্নত হ'য়ে ঐশীশক্তি লাভ কর্‌তে চান, তিনি ভারতীয় আত্মবিৎ সাধকের চরণে লুটিয়ে পড়ুন।

এই সব যুক্তিবাদ ছেড়ে দিলেও ভক্তিবাদীরা গুরুকরণে বিশেষ উপকার লাভ করে থাকেন। যে ধর্ম্মে একখণ্ড পাথরের ভিতর শিব শালগ্রামের সত্তা মেনে নিয়ে ঋষিরা নিত্য সেবার উপদেশ দিয়েছেন, সেই ধর্ম্মেই মানবদেহধারী গুরুর স্থান শিবশালগ্রামের সমপর্য্যায় স্বীকৃত হয়েছে। সেবা-ভক্তির অনুশীলন দ্বারা গুরুমন্ত্র, দেবতা-বিগ্রহাদির মধ্যে আত্মীয়তা বোধ ফুটিয়ে তোলাই সাধন-সোপানের লক্ষ্য। যিনি যতখানি অধিক আত্মীয়তাবোধ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, বুঝতে হবে, তিনি সাধন-সোপানের ততই উচ্চস্তরে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছেন। এই ভাবে আত্মীয়তাবোধ ফুটিয়ে তুলতে তুলতে যে দিন সাধন-সোপানের শেষ ধাপে উঠবেন, সেইদিনই সাধক উপলব্ধি করবেন, সব একাকার,—জল, স্থল, অনল, অনিল, বিদ্বান্, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ইন্দ্রাণী, শূকরী, বিষ্ঠা, চন্দন,—সব এক অখণ্ড ব্রহ্মসূত্রে মণিমালার মত গাঁথা রয়েছে, এক অখণ্ড চিচ্ছক্তিতে সবাই চলেছে, কোথাও ভেদ নাই, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম শক্তি সাম্যবোধে প্রতিভাত, এক অখণ্ড আনন্দ-ঘন-সত্তায় অনুপ্রাণিত। ইহাই যদি আমাদের চরম লক্ষ্য হয়, সেই লক্ষ্য বিষয়ে পৌঁছাতে আমাদের মধ্যে যিনি এগিয়ে গেছেন, সেইরূপ একজন সাধককে গুরুত্বে বরণ ক'রে তাঁকেই কেন্দ্র করে মন প্রাণ দিয়ে সেবা পুজা করে ব্রহ্মসত্তার বোধ ফুটিয়ে তুলতে যাওয়া ছাড়া অন্য আর কি পথ থাকতে পারে? শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদ, শ্রীগুরুর অভয়বাণী,

ভক্তহৃদয়ে কতখানি কার্য্যকরী, ভক্ত না হয়ে বাহির থেকে এ সত্য কে উপলব্ধি করিবে? শ্রীগুরু সিদ্ধ সাধক, ঐ শ্রীশক্তিসম্পন্ন, নিত্যসংশ্লিষ্ট; তাঁর শক্তিপ্রভাবে, তাঁর আশীর্ব্বাদে, তাঁর শুভ ইচ্ছায়, অভাবনীয় ঘটনা যে ভগবানের উপর দিয়ে ঘটেছে, সে কি তার অবিশ্বাস কর্‌তে পারে? আজও আমাদের দেশে শত শত গুরুদাস, শত শক গুরুপ্রসাদ কত শত গুরুজীবননামধারী সন্তানগণ তাঁদের মাতাপিতার গুরুভক্তির এবং গুরুপ্রীতির নিদর্শন হয়ে রয়েছেন। যদি কেউ বল, এসব দৌর্ব্বল্য, আমি বলি,—ওগো সবল মহাশয়! আপনাকে এর মধ্যে এসে কাজ নাই, কেউ'ত বিনা প্রয়োজনে আসে না। আপনিই বা আস্‌বেন কেন?

গুরু-নির্ব্বাচন।

প্রায় অনেকক্ষেত্রেই সামাজিক দায় এড়াবার জন্য যে ভাবে আমাদের দেশে বর্ত্তমানে গুরুনির্ব্বাচন প্রচলিত রয়েছে তার একটু সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন। যিনি হবেন —তৎপদং দর্শিতং যেন—এইরূপ শক্তিমান্ হওয়া, এইরূপ বিশেষণে বিশেষিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীগুরুদেব যদি দীক্ষাদানেরসময়ে শিষ্যকে 'তৎপদম্' অর্থাৎ দিব্যমূর্ত্তি বা জ্যোতিঃ নিজশক্তিসঞ্চালনবলে না দেখিয়ে দেন দিতে

না পারেন, তা হ'লে অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ অর্থাৎ অখণ্ড-মণ্ডলাকার এই চরাচরে যিনি চিচ্ছক্তিতে পরিব্যাপ্ত রয়েছেন —(যেমন তিলে তৈল থাকে, দুগ্ধে স্নেহ থাকে সেইরূপ)— তাঁকে অর্থাৎ সেই ব্রহ্মপদকে কমপক্ষে তাঁর দিব্যমূর্ত্তি বা তাঁর দিব্যজ্যোতিঃ যিনি দেখিয়ে দিয়েছেন অন্ততঃ একটীবারও সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিতেছি। এই যে প্রণাম-মন্ত্রটী শিষ্যগণের মুখে প্রত্যহ উচ্চারিত হ'য়ে আস্ছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই মিথ্যা উচ্চারিত হ'য়ে আস্ছে। কারণ অনেক শিষ্যই দীক্ষাগ্রহণকালে তেমন একটু কিছু দেখেওনি, একটু চিন্তাও করেনি। কেবল কাণে শ্রীগুরুদেবের মুখ থেকে অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ শুনেছে, অনেকেই তার অর্থও জানে না। সেই অপরিচিত শব্দটী কোন কোন শিষ্য কতকটা ভক্তি ও অনুরাগ নিয়ে জপ করেও থাকেন। মন্ত্রটীর অর্থ না জেনে জপ করায়, মন্ত্রে চিচ্ছক্তি উদ্বুদ্ধ না হওয়ায়, মন্ত্র চিরদিন নিদ্রিত হয়েই থাকে, শত লক্ষ জপ করেও কোন ফলোদয় হয় না। আবার কেহ কেহ শ্রীগুরুদেবের বাক্য পাছে লঙ্ঘন করা হয় এই ভয়ে কোনগতিকে ১০৮ বার জপ করেন। তা দাঁড়িয়েও হয়, বসেও হয়, ভাতের থালার সম্মুখে লোলুপদৃষ্টি রেখেও হও, পুকুর-ঘাটে গামছা পরেও হয়! কোনগতিকে ১০৮ বার জপ আঙ্গুল ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি আউড়ে হাতে 'তু' একটা থাপ্পড় মেরে সাধন-ভজন শেষ করেন। বর্ত্তমানে ইহাই বেশীর ভাগ লোকের

সাধনপদ্ধতি। অবশ্য একেবারেই ঈশ্বরবিমুখ হ'য়ে থাকা অপেক্ষা ইহা অনেকাংশে ভাল। এরূপ ক্ষেত্রে এই যে ক্রুটী, গুরু-শিষ্য উভয়ের মধ্যেই আছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়,—গুরু-শিষ্যের মধ্যে যদি কোন সময় মিলন হয় নানাবিধ কথাবার্ত্তায় পরস্পরের বাহাতুরীর গল্প-গুজবে সারা দিনরাত্রিই কেটে যায়, আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গই বড় একটা উঠে না। গুরুদেব সর্ব্বদাই সাবধান থাকেন, কোন শিষ্য যেন কোন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে বসে, শিষ্যও অতি সাবধানতার সহিত পাশ কাটিয়ে চলেন—যাতে শ্রীগুরুদেব সারাবৎসরের ঈশ্বরোপাসনার হিসাব-নিকাশ না চাহেন। বর্ত্তমানে প্রায় অনেকস্থলেই গুরু-শিষ্যের মধ্যে এইরূপ একটা বিচিত্র সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গেছে। ইহার কারণ অন্বেষণ করলে, ইহাই দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক ঠিক শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে গুরু নির্ব্বাচন হয় না। ভগবান্ শ্রীসদাশিবের ও মহর্ষি মনু, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক, বশিষ্ঠ, পরাশর প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রণেতৃগণের মুখামৃতমিশ্রিত অমরবাণীর সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করে গুরুনির্ব্বাচন হয় না। বরং সামাজিক প্রথায় আধ্যাত্মিক পথের প্রদর্শককে গতানুগতিক রীতিতে নির্ব্বাচন করে নেওয়া হয়। যতদিন শাস্ত্রমর্য্যাদার অনুরাগ পুনরায় ফিরে না আসছে, যতদিন মুনি ও ঋষির উপদেশগুলি অভ্রান্ত সত্যস্বরূপ বলে আবার সশ্রদ্ধায় প্রতিপালিত না হচ্ছে, ততদিন গুরুনির্ব্বাচনব্যাপারে ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে মিথ্যা দৃষ্টান্তের দ্বারা অনুস্যূত গতানুগতিক কুসংস্কার সমাজের বুক

থেকে অপনোদিত হবার আশা দুরাশামাত্র। তথাপি ফলাফল যাই হউক—শ্রীগুরুদেবের চরণ স্মরণ করে সত্যস্বরূপ উদ্‌ঘাটনে শাস্ত্রব্যাখ্যায় আত্মতৃপ্তিলাভের এ সুযোগ আমি ত্যাগ কর্‌তে পারি না।

শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন ক'রে স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্‌লে তাহা নিষ্ফল হয় এবং দুঃখের কারণ হয়। ইহা সুস্পষ্ট-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে,—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণীতে। যথা—যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হবেন, তাঁর ঐহিক সুখ, সিদ্ধিলাভ, স্বর্গ মোক্ষ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গতি কিছুই লাভ হবে না। কেহ কেহ শাস্ত্রবিধি অর্থে সুচিন্তিত ব্যবহারিক বুদ্ধি এই অর্থ ধ'রে লন। ইহা স্ববুদ্ধি-কল্পিত অর্থ। শঙ্করভাষ্যে শাস্ত্র বিধি অর্থে ইহাই লিখিত আছে—"যঃ শাস্ত্রবিধিং—শাস্ত্রং বেদঃ ; তস্য বিধিং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানকারণং বিধি-প্রতিষেধাখ্যম্‌।" শ্রীধরস্বামিকৃত টীকায় লিখিত আছে—শাস্ত্রবিধিং বেদবিহিতং ধর্ম্মমুৎসৃজ্য যঃ কামচারতো যথেচ্ছং বর্ত্ততে স সিদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি—ইত্যাদি মহাপুরুষগণের ব্যাখ্যা হ'তে ইহাই বুঝা যায় যে,—যে দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব জানতে হলে শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধকে অনুসরণ করে চলতেই হবে।

এখন শ্রীগুরুদেবের লক্ষণ শাস্ত্রবাক্যানুসারে নির্ণয় করা যাক। বিশ্বসারতন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে লিখিত আছে—সর্ব্বশাস্ত্রপরো দক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা। সুবচাঃ সুন্দরঃ স্বঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ। জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্তমানসঃ॥ মাতাপিতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণঃ। আশ্রমী দেশস্থায়ী চ গুরুরেবং বিধীয়তে। আশ্রমী গৃহস্থঃ। মৎস্যসূক্তে মহাতন্ত্রে ত্রয়োদশ পটলে দেখা যায় মধ্যদেশ সমুদ্ভূতঃ শান্তঃ সর্ব্বগুণৈর্যুতঃ। পুত্রদারৈশ্চ সম্পন্নো গুরু-রাগমসম্মতঃ। তন্ত্র শাস্ত্রকে আগম বলে। আরও রুদ্র-যামলে দেখা যায়,—আদৌ সাধকদেবশ্চ সদাচারমতিঃ সদা ইত্যাদি শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধো বেশবান্॥ শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ শুদ্ধিমান্। আশ্রমী ধ্যান-নিষ্ঠশ্চ ইত্যাদি তন্ত্রোক্ত লক্ষণ হইতে ইহাই বোঝা যায় যিনি গুরু হবেন তাঁকে উপর্য্যুক্ত গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। অর্থাৎ শান্ত, দান্ত, সত্যবাদী, মাতাপিতৃভক্ত শুভদর্শন, শুদ্ধাচারী, পুত্রবান্, বিদ্বান্, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হওয়া চাই। বিদ্বান্ বলিতেই কেবল আক্ষরিক জ্ঞানবানকেই বুঝায় না, কতকগুলি শাস্ত্র অধ্যয়ণ করলেই বিদ্বান্ হয় না। 'যস্তু ক্রিয়াবান্ স এব বিদ্বান্'। যিনি সাধনার দ্বারা কর্ম্মী, উন্নত তিনিই বিদ্বান্। সুতরাং আক্ষরিক জ্ঞান আদৌ না থাক্‌লেও যদি কেহ সাধক, ধ্যাননিষ্ঠঃ আচারবান্ হতে পারেন তা হলেও তিনি গুরুপদবাচ্য হবেন। আবার শাস্ত্রে

সুপণ্ডিত ব্যক্তি ও যদি সাধক না হন, আচারবান্ না হন, ধ্যানপরায়ণ না হন ব্যভিচারী হন তা'হলে তিনি গুরুপদবাচ্য হ'তে পারেন না। গৃহস্থের গুরু গৃহস্থ হওয়া একান্ত প্রয়োজন, ঐরূপ ব্রহ্মচারীর গুরু ব্রহ্মচারী হবেন, বনবাসীর গুরু বনবাসী হবেন আর সন্ন্যাসীর গুরু সন্নাসী হবেন। ইহা লঙ্ঘন করলেই শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করা হবে। কুলচূড়ামণিতন্ত্রে সুস্পষ্ট লিখিত আছে,—উদাসীনো হ্যুদাসীনানাম্ বনস্থো বনবাসিনাম্। যতীনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী। কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে—সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে। যিনি অনেক শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হয়েছেন প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া অর্থে তদ্ভাবাপন্ন হওয়া অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে চলা, সাধক হওয়া, ধ্যাননিষ্ঠ হওয়া ইত্যাদি। এইরূপ যিনি হতে পেরেছেন এমন গৃহস্থই গুরুপদবাচ্য। ইষ্টকপ্রস্তরনির্ম্মিত গৃহে পত্নীসঙ্গবিচ্যুত হয়ে বাস করলেও গৃহস্থ হওয়া যায় না, আবার পত্নীসঙ্গযুক্ত হয়ে গাছতলায় হাঁড়ী টাঙ্গিয়ে বাস করলেও গৃহস্থ হওয়া যায়। ভট্টভাষ্যে উক্ত আছে—ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। যথা তথা হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে। সুতরাং যে কোন স্থানে ধর্ম্মপত্নীর সহিত শান্তিতে বাস করিলেই গৃহস্থ পদবাচ্য হওয়া যায়।

গণেশবিমর্ষিণীতন্ত্রে লিখিত আছে—যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ। বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণ-

দায়িকা। প্রমাদাচ্চ তথাজ্ঞানাৎ পিতুর্দীক্ষা সমাচরেৎ। প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা পুনর্দীক্ষাং সমাচরেৎ। পিতুরিত্যুপ-লক্ষণ, ইতি তন্ত্রসারঃ। ইহা দ্বারা সুপ্রমাণিত হয়,—গৃহস্থেরা যতি সন্নাসী, বনবাসী ও পিতার নিকট কদাচ দীক্ষিত হইবে না, দীক্ষিত হইলে তাহা সুফল দান করে না। যদি কোনরূপ প্রমাদবশতঃ এইরূপ দীক্ষা হইয়া যায়, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় গৃহস্থ গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

গৃহস্থ যদি সৌভাগ্যবশতঃ সিদ্ধবিদ্যা লাভ করবার সুযোগ পান, তৎক্ষণাৎ গুরুবিচার না ক'রে যে কোন আশ্রম থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রমধ্যে এইরূপ একটি মাত্র প্রতিপ্রসব বচন দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তদ্ যথা,—সিদ্ধযামলে, যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে। তদৈব তান্তু দীক্ষেৎ গৃহাণ ত্যক্ত্বা গুরুবিচারণম্। সিদ্ধবিদ্যা সহজলভ্য নহে, যে কোন শিষ্য ইচ্ছা করলেই লাভ করতে পারেন না। উহা সহজে পাওয়া গেলে, "যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে" এক বচনে ভাগ্যবশে-নৈব এইরূপ শব্দের প্রয়োগের কোন সার্থকতা থাকে না। কদাচিৎ হয়ত ঈশ্বরপ্রেরিত বা স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ কোন মহাপুরুষ সন্ন্যাসী জগতে ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের জন্য উপস্থিত হ'য়ে তাঁর কার্য্যের পুষ্টিসাধনের জন্য দু-একটী কোটি-জন্মের কৃততপা ভাগ্যবান্ গৃহস্থকে সিদ্ধবিদ্যা দান ক'রে অপূর্ব্ব

বিভূতীশ্বর ক'রে তুলেছিলেন, সে সব মহাপুরুষ বিধিনিষেধের অতীত ; তাই দেখিয়া অথবা ঐ বচনের সুযোগ লইয়া অনেক সাধু সন্ন্যাসী দলে দলে গৃহস্থকে দীক্ষাদান করে যাচ্ছেন। সকলকেই সিদ্ধবিদ্যা দিচ্ছেন—ইহা কিরূপে সম্ভব হয়। আর "যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেত প্রিয়ে" এই বচনে ভাগ্যবশেনৈব এই শব্দযোজনার উদ্দেশ্য কি রক্ষিত হচ্ছে ? আর ঐ নিষেধবাক্যগুলির বা মূল্য কি থাকচে ?

সন্ন্যাসীগণ শাস্ত্রানুসারে গৃহস্থকে দীক্ষা দিতে পারেন না, যদি শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন ক'রে গৃহস্থকে দীক্ষা দেন সন্ন্যাসীগণও পতিত হবেন। নারদপরিব্রাজকোপনিষদে ইহার বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। তদ্‌যথা—

তুরীয়াতীতাবধুতয়ো মহাবাক্যোপদেশাধিকারঃ—পরমহংসস্যাপি। যতিচর্য্যা—"ন শিষ্যাননুবধ্নীত"।

"ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত", "ন তন্ত্রমন্ত্রব্যাপারঃ"।

"অহংকারো মমত্বঞ্চ চিকিৎসাধর্ম্মসাহসম্। প্রায়শ্চিত্তং প্রবাসশ্চ মন্ত্রৌষধগবাশিষঃ। প্রতিসিদ্ধানি চৈতানি সেবমানো ব্রজেদধঃ"। লোকসংগ্রহযুক্তানি নৈব কুর্য্যান্ন কারয়েৎ।

সন্ন্যাসোপনিষদেও লিখিত আছে,—ন চোৎপাতনিমিত্তাভ্যাং ন নক্ষত্রাণি বিদ্যয়া নানুশাসনবাদাভ্যাম্ ভিক্ষাং লিপ্সেত কর্হিচিৎ।

উল্লিখিত অনুশাসনবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সন্ন্যাসিগণ কেবল সন্ন্যাসিগণকেই মন্ত্রদীক্ষাদান করতে পারেন,

গৃহস্থকে দীক্ষাদান করতে পারেন না। যাঁরা অনিকেতন সন্ন্যাসী, তাঁরা গৃহস্থের গৃহে রাত্রিযাপন করতে পারেন না, স্ত্রীলোককে দীক্ষা দেওয়া ত দূরের কথা, স্ত্রীলোকের মুখ দেখাও ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। নিম্নলিখিত গৃহস্থ ঋষিগণ সন্ন্যাসীদের আদিগুরু। যথা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাগ্যবল্ক, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ভ, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ লিখিত দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ। সনাতনধর্ম্ম গৃহস্থ ঋষিগণের ধর্ম্ম। অন্য তিনটী আশ্রমের প্রাণশক্তি। উৎকৃষ্ট গৃহস্থ না হ'লে সুসন্তানের আবির্ভাব কিরূপে সম্ভব? যাক্—যে দিক্ দিয়ে বিচার করা যাউক না কেন, গৃহস্থগণ সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে পারেন না এবং সন্ন্যাসীগণও গৃহস্থকে দীক্ষা দান করতে পারেন না। বহুসৌভাগ্যবশতঃ একমাত্র সিদ্ধবিদ্যা লাভের সুযোগ পাইলে গৃহস্থ আশ্রমগত গুরুবিচার না করে যে কোন স্থান থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যে সত্য কয়টী দেখতে পাওয়া যায়, অনেক গৃহস্থের শাস্ত্রবাক্য না জানা থাকায় অথবা স্বেচ্ছায় শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করে গৃহস্থ সদ্গুরুর অনুসন্ধান না করে অন্য আশ্রম থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। আমার বিনীত নিবেদন, কয়জন সিদ্ধবিদ্যা লাভ করেছেন, একবার বলুন ত? সত্য যদি গোপন না করেন, দু' একজন ব্যতিরেকে অনেককেই অম্লানবদনে স্বীকার করতে হবে—ওগো যে তিমিরে

সেই তিমিরে। কেবল শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করে অবিধিপূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণে একটা প্রত্যবায়ের সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। শাস্ত্রই আমাদের মধ্যে পাপ পুণ্য ধর্ম্ম অধর্ম্মের সংস্কার সৃষ্টি করে দিয়েছে। অমুক কাজ কর্‌লে পাপ হয়, অমুক কাজ কর্‌লে পুণ্য হয়—ইহা একমাত্র শাস্ত্রবাক্যের উপর বিশ্বাসস্থাপন করে জান্‌তে পেরেছি। শাস্ত্রবাক্য,—অভ্রান্ত, সত্য এবং মঙ্গলকারক। যে শাস্ত্রবাক্যের অনুশাসনে কোন একটা কাজকে পাপ বলে মনে করে নেওয়া গেল, সেই পাপক্ষয়ের জন্য শাস্ত্র যদি গঙ্গাস্নানের উপদেশ দিয়ে থাকেন, তাহা অবিশ্বাস করবার কি আছে? তোমার ইচ্ছার সঙ্গে যে শাস্ত্র-বাক্য খাপ খাবে তাহাই গ্রহণ কর্‌বে, আর যে শাস্ত্রবাক্য তোমার মতের সঙ্গে খাপ খাবে না তাহা পরিত্যাগ কর্‌বে, ইহা কি যুক্তি হ'তে পারে? যতদিন তুমি ভাবাতীত অবস্থায় উপনীত না হচ্ছ, ততদিন তোমাকে শাস্ত্রবাক্য অনুসারে চল্‌তেই হবে। শাস্ত্র বলেছেন—দীক্ষা গ্রহণ কর্‌লে আত্মোন্নতি হয়, পরমার্থ লাভ হয়। তুমি শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসী হ'য়ে দীক্ষা গ্রহণে উদ্যোগী হ'লে, কোথা থেকে দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত, কোথা থেকে উচিত নয়, এই সব বিধি-নিষেধমূলক শাস্ত্র তোমার বুদ্ধির সঙ্গে খাপ খেল না বলে তুমি স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে শাস্ত্রবাক্যকে লঙ্ঘন করে যথেচ্ছ দীক্ষা গ্রহণ কর্‌লে, কি ফল লাভ কর্‌লে? কিছুই না! তুমি চীৎকার করে উঠ্‌লে—ধর্ম্ম মিথ্যা, শাস্ত্র মিথ্যা। আমি বলি—ওগো অব্যবস্থিতচিত্ত

সাধক ! যতদিন ভাবাতীত অবস্থায় না যাচ্ছে, ততদিন শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলিকে অভ্রান্ত মনে করে মেনে চল। তা' না হ'লে সাধন-সোপানে একটুও উঠ্‌তে পার্‌বে না। চিরজীবন ঐরূপ চীৎকার করে কাটাতে হবে।

এখন প্রশ্ন উঠে—এই যে সন্ন্যাসিগণ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে গৃহস্থকে দীক্ষাদান করছেন, এদের মধ্যে সকলেই কিছু রাজকীয় সংস্করণের সুচিক্কণ গৈরিক প্রচ্ছদে ঢাকা ভোগবিলাসী প্রচারের দ্বারা শিষ্যসংখ্যা-বৃদ্ধিকামী সন্ন্যাসী নহেন, অনেক অল্পবিস্তর সিদ্ধৃদ্ধি-বিভূতি সম্পন্ন মহাপ্রাণ সন্ন্যাসিগণও আছেন, তাঁরা নারদপরিব্রাজকো-পনিষদের কঠো'র নিষেধ বাক্যগুলি না শুনিয়া কেন গৃহস্থগণকে দীক্ষাদান করছেন ? তাঁরা কি অর্থলোভী ? তাঁরা কি ব্যবসায়ী ? ইহার উত্তরে বলা যায়—না, তাঁরা অর্থলোভীও নহেন, শিষ্যব্যবসায়ীও নহেন, কামীও নহেন। তাঁরা সরলচিত্ত ও প্রকৃত সাধু এবং আত্মপ্রশংসার দ্বারা তাঁরা শিষ্য-গণকে মুগ্ধ করেন না। তাঁরা কোন ভক্ত গৃহস্থের একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরেই কৃপাপরবশ হ'য়েই প্রথম বিধি লঙ্ঘন করে বসেছেন, তারপর একান্ত অনুগত শিষ্যের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পুনরায় সেই মহাপ্রাণ সাধু বিধিলঙ্ঘন করে বসেন। এই-ভাবে প্রকৃত সাধুগণও লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে গৃহস্থের গুরু হ'তে থাকেন। তখন আর বিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে ইহা চিন্তার অতীত হ'য়ে পড়ে। লঙ্ঘনটা তখন স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়। অন্যান্য

নিম্নস্তরের সাধুসন্ন্যাসিগণও ঐ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুযোগ গ্রহণ করেন। তখন আদর্শ হ'য়ে পড়ে,—সেই সন্ন্যাসীই শ্রেষ্ঠ; তাঁর অসংখ্য অবস্থাপন্ন গৃহস্থ শিষ্যের সংখ্যা বেশী। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে—ইহাই কি সম্ভব যে, একজন প্রকৃত বিভূতি-মান্ সাধু মায়িক জগতের আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে বিধি লঙ্ঘন করে বস্‌বেন? ভুলপথে হাঁটবেন? আমি বলি—কিছুই অসম্ভব নয়। ঐ দেখ মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহর্ষি মেধস ঋষি বলছেন,—তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ। মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ। জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥ উক্ত মন্ত্র দুটীর ব্যাখ্যা টীকাকার এইরূপ করেছেন। যথা,—অহো কোঽয়মপূর্ব্বো মহিমা মহামায়ায়াঃ যৎ আত্ম-হিতানুসন্ধায়িনামপ্যেবং মোহং করোতীতি বিস্ময়মানং নৃপং কৈমুতিকন্যায়েনাহ তদিতি। তৎ তস্মাৎ এতৎ জগৎ তয়া মহামায়য়া সংমোহ্যতে ইতি অত্র বিষয়ে বিস্ময়ো ন কার্য্যঃ। য়তঃ জগৎপতেঃ সংসারপালকস্য হরেশ্চ জগৎসংহারকস্যাপি যোগনিদ্রা; অন্যেষাং কা কথা ইতি ভাবঃ (হেতুগর্ভমিদম্; যোগরূপনিদ্রা পরমানন্দকরী শক্তিরিত্যর্থঃ) নন্ন অজ্ঞানজন্য-সংসারস্য জ্ঞানে নিবৃত্তা মহামায়য়া কিং কার্য্যমিতি চেৎ, তত্রাহ জ্ঞানিনামিতি। সা মহামায়া জ্ঞানিনাং বিবেক-বতামপি চেতাংসি অন্তকরণানি বলাদাকৃষ্য সবশীকৃত্য মোহায় মোহনিমিত্তং (সপ্তম্যর্থে বা চতুর্থী—মোহে)

প্রযচ্ছতি নিক্ষিপতি (সৌভরিবিশ্বামিত্রাদেরপি ক্বচিৎ তথাদর্শনাৎ)।

মেধস ঋষি বলেছেন—মহামায়ার কি অপূর্ব্ব মহিমা। জগৎপতিও মহামায়ার প্রভাবে যোগনিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলেন, সমস্ত জগৎ মহামায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন। আত্ম-হিতানুসন্ধায়ী জ্ঞানিব্যক্তিগণের অন্তঃকরণও মায়িক জগতে মহামায়াকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হয়! এ বিষয়ে বিস্ময়ের কি আছে? রাজা ভরত বিষয়-বৈভব, স্ত্রী পুত্র সমস্ত ত্যাগ করে নির্জ্জন বনে যোগস্থ হ'য়েও একটী অনাথ মৃগশিশুর মায়ায় পড়ে এমন আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছিলেন যে, তাঁকে মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করতে হ'য়েছিল। বিশ্বামিত্র ঋষি, সৌভরি মুনিও মায়িকজগতের আকর্ষণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে পড়েছিলেন, সুতরাং সাধু সন্ন্যাসিগণও ঐরূপ গৃহস্থশিষ্যগণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়বেন, শাস্ত্রবিধি পদদলিত করে আশ্রমগত অনুশাসন লঙ্ঘন করে গৃহস্থগণকে দীক্ষাদান করে ফেলবেন ইহা আর বিচিত্র কি?

গৃহস্থগণের মোটেই উচিত নহে কাহারও আশ্রমধর্ম্মে বাধা দেওয়া। অনুনয়বিনয়ের দ্বারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা আত্মতৃপ্তির জন্য সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারিগণের নিকট গৃহস্থ কদাচ দীক্ষিত হবেন না। ওগো গৃহস্থ! তোমার গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুরাগ যিনি মনের জোরে ত্যাগ করে ব্রহ্মসন্ধানে ছুটেছেন, যিনি আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে নির্ব্বাণপথের পথিক

হয়েছেন, তাঁকে অনুরোধ উপরোধ করে দীক্ষিত হয়ে আবার পিতাপুত্রের মায়িক সম্বন্ধ স্থাপন কর'না—যে সম্বন্ধ তিনি ছেড়ে এসেছেন, মায়িকজগতের সেই আত্মীয়তাবন্ধনে তাঁকে আবদ্ধ করনা। যে বন্ধন তিনি ছিঁড়ে এসেছেন, তাকে সেই ছিন্ন বন্ধনে বদ্ধ করনা ; তাতে তাঁর বৈরাগ্যে বাধা পড়বে, তাঁর আশ্রমব্রত ভঙ্গ হয়ে যাবে। ওগো গৃহস্থ ! কারও আশ্রমব্রত ভঙ্গ ক'রনা, বরং প্রত্যেক আশ্রমধর্ম্মের পুষ্টিসাধন করতে চেষ্টা ক'র। সাধুসন্ন্যাসীও ব্রহ্মচারীকে যথাবিধিসম্মানে সম্মানিত করবে, সেবা-পরিচর্য্যা করবে, কিন্তু শাস্ত্রীয় অনুশাসনবাক্য লঙ্ঘন করে কদাচ দীক্ষিত হবে না। গৃহস্থ ! তুমি ঠিক ঠিক গার্হস্থ্যধর্ম্মের অনুসরণ কর, তোমার ধর্ম্মার্থকামমোক্ষফলপ্রদ পঞ্চযজ্ঞের প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর। কোন আশ্রমের সাহায্য নিতে হবে—চতুর্ণামাশ্রমাণাং গার্হস্থ্যঃ শ্রেষ্ঠ আশ্রমঃ, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করে মনে বল সঞ্চয় করবে। ফল পাকলে আপনি পড়ে যায়। টানাটানি করার জন্য কাউকে ডাকতে হবে না।

পিতাপিতামহের গুরুবংশ একেবারেই ত্যাগ করতে নাই—সে বংশের হস্তিমূর্খ গণ্ডমূর্খ ব্রাহ্মণের বৃত্তিত্যাগী, লোভী, রোগী আচারহীন অসাধক ব্যক্তির নিকট দীক্ষাগ্রহণ করতেই হবে, নতুবা নরকে যেতে হবে, এইরূপ ধারণা অথবা সংস্কার এখনও অনেক সমাজে রয়েছে। ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা ইহা পরকালের পথরোধী কুসংস্কার। শাস্ত্র নির্ম্মম নহে, শাস্ত্র যুক্তিহীন নহে, বুঝতে না পেরে মুরব্বীয়ানা চালে

শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘনের উপদেশ দিওনা। সামাজিক জীবনযাত্রায় শাস্ত্রব্যাখ্যা, দেশকালপাত্রভেদে বরং একটু এদিক ওদিক করা চলে, কারণ উহা পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু আধ্যাত্মিক শাস্ত্রবিধি চির অপরিবর্ত্তনশীল। যে বিধি অনুসারে চললে, আত্মতত্ত্ব লাভ করতে পারা যায়, সকল দুঃখের অবসান হয়, যে শাস্ত্রবিধি অর্থবাদ হইতে কল্পিতবিধি নহে, সামাজিক শৃঙ্খলারক্ষার বিধি নহে, সত্যদর্শন করতে হলে যে বিধির সাহায্য গ্রহণ করতে হবে, সে বিধিও অভ্রান্ত সত্য। যুগপ্রভাবে অনেকবিষয়ে রঙ বদলাতে পারে, কিন্তু যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য।

পিতাপিতামহের গুরুবংশে যদি নির্লোভ আচারবান্ সাধক ব্যক্তি বর্ত্তমান থাকেন, তাঁকে ত্যাগ করে অন্যত্র গুরুকরণ করতে নাই। তাই পিঙ্গিলাতন্ত্রে শ্রীসদাশিব বলেছেন পৈত্রং গুরুকুলং যস্তু ত্যজেদ্বৈ ধর্ম্মমোহিতঃ। স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্। অর্থাৎ পিতাপিতামহের গুরুকুল ত্যাগ করতে নাই তাতে পাপ হয়, নরকে যেতে হয়। কিন্তু মঙ্গলময় শ্রীসদাশিব পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেছেন যে, অশেষদোষ-দুষ্ট ব্যক্তি, আক্রান্তশ্বাসকাশযক্ষ্মাগলিতকুষ্ঠ ব্যক্তি, লোভী চরিত্রহীন অসাধক ব্যক্তি, মূর্খ আচারহীন কুসঙ্গী ব্যক্তি, দেবাগ্নিগুরুবিদ্যাদিপূজাবিধিপরাঙ্মুখ ব্যক্তি, আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী ব্যক্তি, ব্রাহ্মণবৃত্তিত্যাগী ব্যক্তি, সন্ধ্যা-তর্পণ-পূজাদি-মন্ত্রজ্ঞান-বিবর্জ্জিত ব্যক্তির নিকট কদাচ দীক্ষা গ্রহণ করিবে না।

ঐরূপ ব্যাক্তির নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর্‌লে নরকগামী হতে হয়, ইহকালে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় না। অথচ কুসংস্কারের প্রভাবে অনেকেই গুরুবংশে উপযুক্ত ব্যাক্তি না থাকায় মূর্খ ব্যক্তির নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর্‌তে রুচিসম্পন্ন হন না। আবার সেই গুরুবংশের মূর্খ ব্যক্তিটীকে ত্যাগ করে অন্যত্র সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তেও সাহসী হন না। এই দোটানায় পড়ে, অনেক ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি দীক্ষাবর্জ্জিত জীবন যাপন কর্‌ছেন। তাঁদের মূল্যবান্ সময় এই ভাবেই নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু শাস্ত্র উদাত্তকণ্ঠে বল্‌ছেন—যদি তোমার পিতাপিতামহের গুরুবংশে উল্লিখিত দোষগুলি ঘটে থাকে, সে বংশে যদি জ্ঞানী ব্যক্তির উদ্ভব না হয়ে থাকে, ঐ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র দীক্ষা গ্রহন কর। ঐ শোন কামাখ্যাতন্ত্রে শ্রীসদাশিব পঞ্চমুখে কি বল্‌ছেন,—অন্নাকাঙ্ক্ষী নিরন্নং হি যথা সংত্যজতি প্রিয়ে। অজ্ঞানিনং বর্জ্জয়িত্বা শরণং জ্ঞানিনাং ব্রজেৎ॥ মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ। জ্ঞানলুব্ধস্তথাশিষ্যো গুরো গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ। আরও শোন —যদি নিন্দ্যঞ্চ তৎপাত্রং স্বর্ণং বাপি কুলেশ্বরি। তদা ত্যজেৎ তৎপাত্রং অন্যপাত্রেণ ভক্ষয়েৎ।

অন্নের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি, যেমন নিরন্নব্যক্তির নিকট যায়না, যাঁর নিকট অন্ন আছে, তাঁর নিকট গমন করে, মধুপ্রয়াসী ভ্রমর মধুহীন পুষ্প ত্যাগ করে যেমন মধুযুক্ত পুষ্পের উপর গিয়ে বসে, সেইরূপ জ্ঞানলুব্ধশিষ্য জ্ঞানবান্ সাধকগুরুর নিকট গমন

কর্‌বে। স্বর্ণপাত্রও যদি দোষদুষ্ট হয় তাহাও ত্যাগ করে অন্যপাত্রে ভোজন কর্‌বে, সেইরূপ লোভী আচারহীন অসাধক ব্যক্তিকে ত্যাগ করে অন্যত্র উপযুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষিত হবে। পিতাপিতামহের গুরুবংশে দীক্ষাদান করবার উপযুক্ত ব্যক্তি যদি স্ববৃত্তিতে থাকেন, তাঁকে কদাচ ত্যাগ কর্‌তে নাই—এইরূপ তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—ইহার মূলে একটী সত্য আছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, কর্ম্মকারের ছেলে ভাল কর্ম্মকার হয়, কুম্ভকারের ছেলে ভাল কুম্ভকার হয়, ঐরূপ জ্ঞানীর ছেলে ভাল জ্ঞানী হয়। বুঝে দেখ—তোমার পিতৃদেব যাঁর নিকট হ'তে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে ধন্য হয়েছেন, যাঁর ক্ষণিক দর্শন স্পর্শনে স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করেছেন, সেই গুরুদেবের শুক্র-শোণিতে যিনি উদ্ভুত, তাঁর স্নেহে যিনি মথিত, তাঁর দিবারাত্র সংসর্গে যিনি পরিবর্দ্ধিত, তিনি তোমাকে দীক্ষা দিবার উপযুক্ত ব্যক্তি, ইহাতে সন্দেহ কি? ইহা ত সৌভাগ্যের কথা। একটা ধারাবাহিক পারিবারিক সম্বন্ধ যাঁদের সঙ্গে পুরুষাণুক্রমে চলে এসে একটী নিবিড় আত্মীয়তার সৃষ্টি হ'য়ে গেছে, যাঁদের আধ্যাত্মিক স্পন্দনে বা শক্তিসঞ্চারে তোমার পিতৃকুলের কুলকুণ্ডলিনী বা জ্ঞানকোষ স্পন্দিত হয়েছিল, সেই সেই মহাপুরুষগণের ধারাবাহিক বক্ষঃশোণিতের সংযত স্পন্দনে যার জন্ম হয়েছে, তিনি তোমার গুরু হবেন, তার চেয়ে পরমাত্মীয় পরমহিতৈষী, এমন গুরু কোথায় পাবে—ইহাই

গুরুবংশ থেকে দীক্ষা গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পাছে মোহবশতঃ রাতারাতি বড়লোক. হ'বার বা উচ্চপদ লাভের মিথ্যা-মোহে বিমুগ্ধ হ'য়ে এই উপযুক্ত চির আত্মীয়টীকে ত্যাগ করে ফেল, সেইজন্যই শ্রীসদাশিব বিশেষভাবে নিষেধ করে গেলেন। ব্যাসদেবের পুত্র, শ্রীশুকদেব বলেছেন—ইহাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু এই বিশ্বমাতার বিস্তৃত বক্ষে মধ্যে মধ্যে অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসও দেখা যায়। একই বৃক্ষে সুপুষ্ট, অপুষ্ট, আবার কীটদষ্ট সব রকম ফলই ফলে থাকে, আবার সময় সময় ফলাভাবও ঘটে থাকে। সেইজন্য শ্রীসদাশিব তৎক্ষণাৎ সাবধান করে দিলেন,—স্বর্ণপাত্র যদি অশেষদোষদুষ্ট হয় অর্থাৎ ঐরূপ পবিত্র গুরুবংশ যদি সাধনপথে বিচ্যুত হয়, সে পাত্রও ত্যাগ করিবে, অর্থাৎ সে গুরুবংশও ত্যাগ করিবে। সুতরাং পিতাপিতামহের গুরুবংশের গুরু হ'বার মত শাস্ত্রীয় লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি থাকেন, তা' হ'লে কোনমতেই তাঁকে ত্যাগ করবে না,—তাঁকে ত্যাগ করলে মহাপাপ ও অনিষ্ট হয়, আর যদি গুরুবংশে যোগ্যব্যক্তি না থাকেন অর্থাৎ গুরুপুত্রগণ আছেন বটে কিন্তু কেহ চাকুরীজীবী, কেহ ব্যবসায়ী অথবা অন্যবৃত্তিগ্রহণকারী, দীক্ষা দিবার সময় উপস্থিত হ'লে গুরুদেব সেজে দীক্ষা দিয়া থাকেন, ঐ বিষয়ে তাঁদের চর্চ্চা বা অনুশীলন কিছুই নাই,—পাছে গুরুবংশ ত্যাগ হ'য়ে যায় বলে এরূপ শাস্ত্রীয় প্রমাণে অযোগ্য ব্যক্তির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করলেও পাপ হয় এবং অনিষ্টও হয়, আত্মারও অবনতি হয়। বিধবা

স্ত্রীলোকের নিকট কদাচ দীক্ষা গ্রহণ কর্‌তে নাই। যোগিনী তন্ত্র বল্‌ছেন,—সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া। সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা, সুশীলা, পূজনে রতা। গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবা পরিবর্জ্জিতা।

বিধবা ভিন্ন সকল নারীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর্‌তে পারা যায়; যদি তিনি সাধ্বী, সদচারবিশিষ্টা, গুরুভক্তা, জিতেন্দ্রিয়া, সকল মন্ত্রের তত্ত্বজ্ঞা, সুশীলা এবং সাধিকা হন।

সমাজে দেখা যায়—গুরুবংশে পুরুষলোক না থাক্‌লেও সংস্কারবশে অনেকেই উপগুরু খাড়া করে বিধবা স্ত্রীলোকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। ইহা অশাস্ত্রীয়; কিন্তু এইরূপ অশাস্ত্রীয় অনেক ব্যাপার সমাজে এমনভাবে চলে আস্‌ছে, যেন উহাই শাস্ত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ইহার কারণ শাস্ত্রবাক্যে কি আছে, না আছে, সমাজ বড় একটা জান্‌তে চায় না, সমাজ যাহা দেখে, সেই দৃষ্টান্তকেই বড় বলে মনে করে নেয়। সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, যাহাই অনুসরণ করুন না কেন, সমাজের অন্যান্য লোক সেই দৃষ্টান্তকেই মেষপালের ন্যায় অনুসরণ করে চলে। এই নীতি সমাজের অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আস্‌ছে। শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌গীতায় উক্ত আছে—যৎ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তৎতদেবেতরো জনঃ যৎ কুরুতে প্রমাণং লোকস্তদনুবর্ত্ততে। অর্থাৎ সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করে থাকেন, ইতর লোকেরা সেই সেইগুলি অনুসরণ করে থাকে।

সমাজের সৎসাহসী ব্যক্তিরা যদি গৃহস্থ সদ্গুরুর অন্বেষণ করেন এখনও একেবারে তাহা দুর্ল্লভ নহে। সমাজে যিনি যত বড়ই বিদ্বান, ধনবান্ হউন না কেন,—তাঁকে শাস্ত্রানুসারে চল্‌তেই হবে, নতুবা তিনি ধর্ম্মজগতে অচল। অসাধক ব্যবসায়ী শক্তিহীন কুলগুরু যদি সমাজে গৃহীত না হয় অবশ্যই তাঁরা এবং তাঁদের বংশধরেরা সাধক ও শক্তিশালী হ'বার চেষ্টা কর্‌বেন, ফাঁকি দিয়ে অর্থাৎ সাধন ভজন না করে, লেখাপড়া না শিখে, আচারবান্ নিষ্ঠাবান্ না হ'য়ে গুরুপদে বরণ হওয়া যদি অচল হয়, তা' হ'লে গুরুকুল নিশ্চয়ই সাধক ও শিক্ষিত হ'য়ে উঠবে। অচল জিনিষ চল্‌ছে বলেই ত ভাল জিনিষ আমদানী হচ্ছে না।

আজ সমাজের এত দুর্দ্দশা কেন—সমাজের যাঁরা নেতা ছিলেন সেই গুরু-পুরোহিতগণের মধ্যে অনেকেই আজ মেরুদণ্ড-হীন তাঁদের সে আদর্শ ত্যাগ নাই, সে আদর্শ শিক্ষা নাই, সে সাধনভজন নাই, সে সৎসাহস নাই। বিত্তশাঠ্য যজমান শিষ্য যদি কিছু অন্যায় করেন,—তার প্রতিবাদ করিবার শক্তি নাই, বরং যজমান শিষ্যের ভয়ে আজ তাঁরা ভীত সঙ্কুচিত। পবিত্র আসন থেকে তাঁরা আজ অনেক নেমে এসেছেন। গুরুদেব আজ শিষ্যদের বিদূষকের কাজ কর্‌ছেন। পুরোহিত মহাশয় আজ বেদমন্ত্রের অনুশীলন ছেড়ে দিয়ে যজমানের তোষামোদের অনুশীলনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌ছেন। দু'চার জন ব্যবসায়ী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী, বা বৈরাগী, গৃহস্থ গুরুর এই

এই অধঃপতনের সুযোগ নিয়ে সদ্‌গুরু সেজে তাঁদের ব্রহ্মচিন্তার অনুশীলন সংক্ষেপে সমাধা করে শাস্ত্রীয় নিষেধকে অগ্রাহ্য করে যেন ভগবদাদিষ্ট হয়েই, যেন পাতকী উদ্ধারের ভঙ্গিতেই দলে দলে গৃহস্থকে দীক্ষা দিতে নেমে এসেছেন। কত প্রচারক প্রচারপত্র হাতে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আজ ধর্ম্মের কি অধঃপতন! কাম্যকর্ম্মফলত্যাগী সাধু সন্ন্যাসী আজ সকাম গৃহস্থশিষ্যের অভিলাষ পূর্ণ করবার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত, সকাম দীক্ষাদানের জন্য নানা ছলে শিষ্যসংগ্রহে তৎপর। ঐ সব ব্যবসায়ী সাধু সন্ন্যাসীগণ, নির্জ্জন স্থানে বা মাঠে ঘাটে সমাধিস্থ হন্ না, বহুলোক সমাগত হলেই তাঁদের ভাবসমাধি হয়। কেউ কেউ আবার অতিরিক্ত ভক্তি দেখিলে জনগণকে একেবারে মুগ্ধ কর্‌বার উদ্দেশ্যে সংকীর্ত্তনের দল নিয়ে নগরকীর্ত্তনে বাহির হয়েও পড়েন। অনেক আশ্রমধারী সন্ন্যাসীর পূর্ব্বাশ্রমের পরিণীতা সাধ্বী সতী স্ত্রী জীর্ণ কুটীরের কোণে বসে দীনহৃদয়ে আজও কাঁদছেন; আর তিনি অমুকানন্দস্বামী হ'য়ে—যে নারীর মুখদর্শনে বা সংসর্গে ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসধর্ম্মের ব্রত ভঙ্গ হয় ব'লে গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ ক'রে এসেছেন, এসেও বহু নারীগণপরিবৃত হয়ে সুরম্য অট্টালিকার চিকনশয্যায় ব'সে ধনীর দুলালের মত দয়া করে তাঁদের সেবা গ্রহণ কর্‌ছেন, এবং কৃপা করে তাঁদের মুক্তির সন্ধান ব'লে দিচ্ছেন। কিন্তু এখনও বর্ত্তমান যুগে এমন নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ সাধু সন্ন্যাসী আছেন,—যাঁরা মোটেই সহজলভ্য নহেন। যাঁদের কদাচিৎ

দর্শনে গৃহস্থ ধন্য হন, যাঁদের কদাচিৎ পাদস্পর্শে জনপদে মারিময় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, যাঁদের কঠোর তপস্যালব্ধ বিভূতি সুযোগবাদী গৃহস্থেরা পণ্যরূপে গ্রহণ করতে পায় না, যাঁরা সহস্র লোকের অনুরোধে অনুরুদ্ধ হয়েও গৃহস্থকে দীক্ষা দেন নাই, যাঁদের ক্বচিৎ সংসর্গে অনেক গৃহস্থের বিষয়-বাসনার চাদরে ঢাকা মোহনিদ্রা ভেঙ্গে গেছে, সেই সব মহাপ্রাণ সাধু সন্ন্যাসীর দ্বারা জগতে কতই কল্যাণ হচ্ছে,—হে গৃহস্থ, তুমি ঐ সব সত্যাশ্রয়ী সাধু সন্ন্যাসী-গণকে সশ্রদ্ধ সেবা কর,'—তোমার সংসারের কল্যাণ হবে। কিন্তু স্মরণ রেখ'—ঐ সব সাধু সন্ন্যাসীর সংখ্যা খুব বেশী নয়। আজ সমাজদেহে ব্যভিচারকীট প্রবেশ করেছে। সমাজদেহ আজ জীর্ণ দীর্ণ ও কীটদষ্ট। এর জন্য সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা দায়ী। তাঁরা নানা অজুহাতে সাধনসোপানে উঠতে চান না, পূর্ব্বজন্মের পুঁজি ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছেন ব'লে আপাত প্রয়োজন অনুভবও করেন না। সমাজের সাধারণ লোকেরা অপেক্ষাকৃত বড় লোকের দোহাই দিয়ে আচার ও অনুশীলনবিমুখ হয়ে পড়ছেন। কাজেই সংসারে সৎপুরুষের অভাব হয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। আজ যদি শাস্ত্রানুসারে সমাজের মেরুদণ্ড আচারবান্ শিক্ষিত সাধক গুরুপুরোহিত প্রতি ঘরে ঘরে নির্ব্বাচিত হন, তা'হলে এ দুর্দ্দিনের অবসান হতে পারে। বাঙ্গালার ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে—নিষ্ঠাবান্ ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণের যখন এই বাঙলা দেশে

অভাব হয়েছিল আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ কান্যকুব্জ হতে পুরোহিতরূপে আমন্ত্রিত হ'য়ে এদেশে পদার্পণ করেছিলেন। আজ আমরা সেই সাধক নিষ্ঠাবান্ মহাপুরুষগণের এমন অপদার্থ সন্তান যে আমাদের বাঙ্লার ভাণ্ডারে এখনও যে অফুরন্ত রত্ন রয়েছে, সেগুলিকে শাস্ত্রানুসারে একটু সংস্কার করে নেবার সৎসাহসও আমাদের নাই।

দীক্ষা।

আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্ররূপ জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃতবিদ্য চিকিৎসক দেহের ব্যাধি বিনাশ করে থাকেন, এইজন্য লোকে স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে শরীর অসুস্থ হলেই বা অসুস্থ হবার সম্ভাবনা থাক্‌লেই ঐ সব কৃতবিদ্য চিকিৎসকের অধীন হয়ে তাঁদের উপদেশমত ঔষধাদি সেবন, ও নিয়ম প্রতিপালন করে থাকেন; ঠিক সেইরূপ হিন্দুসন্তানগণ, মানসিক ব্যাধি উপস্থিত হলে বা সম্ভাবনা থাক্‌লে, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাঁরা কৃতবিদ্য এবং অগ্রসর, সেই শ্রী গুরু-দেবের নিকট গমন করে দীক্ষাদিগ্রহণ ও নিয়ম প্রতিপালন করে থাকেন। দৈহিক ব্যাধির উপশম কর্‌তে হলে যেমন চিকিৎসকের মতানুবর্ত্তী হয়ে চল্‌তে হয়,—নতুবা ব্যাধিনিরাময় হয় না। ঠিক সেইরূপ মানসিক ব্যাধির হাত হতে নিস্তার

পেতে হ'লে শ্রীগুরুর উপদেশমত শাস্ত্রমতানুবর্ত্তী হয়ে চল্‌তে হয়, নতুবা মানসিক রোগের উপশম হয় না। শারীরিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ঔষধসেবনাদিরূপ প্রক্রিয়াগুলি যেমন অবশ্যকরণীয়, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে দীক্ষাদিগ্রহণরূপ প্রক্রিয়াগুলি ঠিক তেমনই করণীয়। কি বা জড়জগতে, কি বা আধ্যাত্মিক জগতে কোথাও উচ্ছৃঙ্খলতার স্থান নাই, সর্ব্বত্রই নিয়মানুবর্ত্তিতা। যত বড়ই চিকিৎসক হউন, বিনা ঔষধাদি-প্রয়োগে যেমন রোগীর মাথায় হাত বুলাইয়া আর দুটো মিষ্ট উপদেশ দিয়া নিরাময় করে তুল্‌তে পারেন না, তেমনি যত বড়ই শক্তিশালী গুরুদেব হউন, প্রক্রিয়াগুলিকে একেবারেই উঠাইয়া দিয়া প্রাকৃতিকনিয়মের বহির্ভূত কাজ করেন না; কর্‌তে দেখি নাই, এমন ইতিহাসও নাই। অবতারবিশেষ শ্রীগুরুদেবও শিষ্যকে দিয়ে কিছু না কিছু কাজ করিয়ে নেন। নিত্যসিদ্ধ পরমভক্ত ধ্রুবচরিত্রেও দেখ্‌তে পাই, শেষ পর্য্যন্ত তাঁকেও দীক্ষাগ্রহণে বাধ্য হতে হয়েছিল। তবে পদ্মপলাশ-লোচনের দর্শন পেয়েছিলেন। পরিণতিকে বিসর্জ্জন দিলে যেমন মহাকালের সত্তা উপলব্ধি হয় না, তেমনি প্রক্রিয়া-গুলিকে বিসর্জ্জন দিলে সৃষ্টিতত্ত্ব দাঁড়াতে পারে না। সৃষ্টিতত্ত্ব অনন্তের কোলে মিশে গেলে, ভক্ত শিষ্যেরও উদ্ভব সম্ভব হয় না।

সুতরাং দীক্ষাগ্রহণ প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের অবশ্যকর্ত্তব্য। শাস্ত্রে উক্ত আছে—দীক্ষাহীন ব্যক্তি পশুর সমান। আজ

কাল দীক্ষাগ্রহণ, দেবসেবা, উহা একটা দুর্ব্বলতার পরিচয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষেরা মনে করেন স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ দুর্ব্বলপ্রকৃতি ; তাই তঁাদের উপর ঐসব কাজ ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়েছেন। আবার স্ত্রীলোকেরাও অনেকে দীক্ষিত হন না, কেউ বা ইচ্ছাপূর্ব্বক হন না, কেউ বা কন্যাদি-প্রতিপালন ও স্বামিসেবার অজুহাতে যৌবনে সময় পান না, বার্দ্ধক্যে দায়ঠেলা মনে করে, অথবা কি জানি কি হয়, যদি বা পরলোকে গিয়া শাস্তি পেতে হয়, এইরূপ একটা ভয়ে বা সংস্কারবশে মৃত্যুর দুচারদিন পূর্ব্বেও দীক্ষিত হয়েলন। কিন্তু ঐ বৃদ্ধকালে দীক্ষিত হয়ে বিশেষ কিছুই ফল হয় না। সাধনসোপানে উঠ্‌তে হলে প্রচুর অভ্যাসের প্রয়োজন, তখন আর সময় থাকে না। যৌবনকালই ঈশ্বরের উপাসনার উৎকৃষ্ট সময়। সে সময় মনোবৃত্তি তাজা থাকে, টাট্‌কা ফুল যেমন মনকে আকর্ষণ কর্‌তে পারে, বাসিফুল তেমন পারে না, ঠিক সেইরূপ যৌবনকালের মনোবৃত্তি যেমন ঈশ্বরের উপাসনায় সাফল্যলাভ কর্‌তে পারে, বৃদ্ধকালের অনভ্যাসী মনোবৃত্তি তেমন পারে না। "বরমেকাহুতিঃ কালে নাকালে লক্ষকোটয়ঃ", সময়ে একটা আহুতিতে যে কাজ হয়, অসময়ে লক্ষ আহুতি দিলেও সে কাজ হয় না। ওগো, পাখীর গলায় কাঁটি বাহির হয়ে গেলে, সে পাখী আর পড়ে না, সে পাখী রাধাকৃষ্ণ বুলি আর বল্‌তে পারে না—এমন সত্য কথা ভুল্‌লে চল্‌বে কেন ?

বৈদিকযুগে নারীর প্রথম পুষ্পোদ্গমে গর্ভাধানসংস্কার হত। গর্ভাধানে এখন আর সে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয় না। এখন আর সে উদাত্ত পূতমন্ত্রধ্বনি নারীর নবপ্রস্ফুটীত জরায়ুতে স্পন্দিত হ'য়ে তার নবকুসুমের দলে দলে হিল্লোল খেলে না, ভবিষ্যৎ মহাপুরুষের আগমনী-গীত আর সে গাহে না। বৈদিক সংস্কার নির্ব্বাণপ্রায়, কিন্তু এখনও তন্ত্রোক্ত সংস্কার সজীব রয়েছে। তন্ত্র বলিলেই কেবল কালীপূজা বুঝায় না। হিন্দু-ধর্ম্মে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যিনি তন্ত্রমতে কিছু না কিছু করে থাকেন। গাণপত্য, সৌর, শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত, এই পঞ্চবিধ উপাসক প্রত্যেকেই তান্ত্রিক। উপাসকগণের অধিকারভেদে তন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা-পদ্ধতি বা পৃথক্ পৃথক্ সাধন-সোপান নির্ম্মিত হয়েছে। বেদে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবগুলি সকলে গ্রহণ কর্‌তে সমর্থ হ'ত না, সকল বৈদিক অনুষ্ঠানে সকলের অবাধ অধিকারও ছিল না, তাই পরম কল্যাণময় সদাশিব জগজ্জননী ভগবতীর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আপামরসাধারণ জীবের কল্যাণের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি কর্‌লেন। হিন্দুসন্তান-গণের মধ্যে বেদানুষ্ঠানে সকলের অধিকার ছিল না। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে অতি বড় লম্পট অতি বড় দুরাচার আবার অতি বড় মহাপুরুষকেও যথাযোগ্য অধিকার দিলেন। কাহাকেও নিরাশ কর্‌লেন না। এমন উদার শাস্ত্র জগতে আর নাই—এমন সহজ-সাধন পদ্ধতিও জগতে অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে দশবিধ সংস্কারের মধ্যে দু' চারটী সংস্কার

শ্রাদ্ধকাণ্ড ও প্রতিমাকাণ্ড এখনও বৈদিকমতে অনুষ্ঠিত হ'য়ে আস্‌ছে। শান্তি-স্বস্ত্যয়নগ্রহযাগ প্রভৃতি হইতে গুরুকরণ দীক্ষা জপপূজা যা কিছু সাধনাদি কর্ম্মকাণ্ড সবগুলিই তন্ত্রমতে হ'য়ে আস্‌ছে। যাক্, এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। এখন বল্‌ছিলাম—গর্ভাধানরূপ বৈদিক সংস্কার যখন আমাদের সমাজে আর বড় একটা প্রচলিত নাই তখন নারীকুল প্রথম রজস্বলার পরই যদি গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে লন, যদি গুরুদত্ত মন্ত্রের পবিত্রস্পন্দনে দেহের রক্ত, মাংস, প্রাণবায়ু এমন কি দেহস্থ অণু পরমাণু পর্য্যন্ত শোধিত করে লন, শ্রীগুরুর শক্তি-সঞ্চালনে যদি সমস্ত শরীরটা সংস্কৃত ও পবিত্র করে লন,— জরায়ু অবশ্যই সংস্কৃত হবে এবং পবিত্র হবে; ফলে দীর্ঘজীবী পুত্রের মাতা হবেন, মৃতবৎস্যাদোষ আস্‌তে পারবে না, মহা পুরুষগণের জননী হবার সৌভাগ্যলাভ করতে পারবেন।

কেবল তাহাই নহে,—বিধিপূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণের দ্বারা উপপাতক মহাপাতকাদি পাপক্ষয় হয়। রত্নেশ্বর তন্ত্রে লিখিত আছে,—উপপাতকলক্ষাণি মহাপাতককোটয়ঃ। ক্ষণাৎ দহতি দেবেশি দীক্ষা হি বিধিনা কৃতা। অর্থাৎ শ্রীসদাশিব ভগবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে দেবেশি! যদি বিধিপূর্ব্বক দীক্ষা কেহ গ্রহণ করেন, তাঁহার লক্ষ লক্ষ উপপাতক ও কোটী কোটী মহাপাতকের তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হয়। মৎস্যসূক্তে লিখিত আছে,—অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ। অদীক্ষিতানাং

মর্ত্ত্যানাং দোষং শৃণু বরাননে। অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতম্। তৎকৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্ব্বং যাতি হ্যধোগতিম্॥ শ্রীসদাশিব বলিতেছেন—হে প্রিয়ে! অদীক্ষিত ব্যক্তি যে সমস্ত জপপূজাদি ক্রিয়া করিয়া থাকেন, পাথরের বুকে বীজ বপন করিলে যেমন তাহা অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ বিফল হয়। হে বরাননে! অদীক্ষিত ব্যক্তির দোষ শ্রবণ কর,—অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন বিষ্ঠাসম এবং জল মূত্রসম জানিবে। তাহাদের কৃত শ্রাদ্ধাদি যাবতীয় দৈবকার্য্য সমস্তই অধোগতি প্রাপ্ত হয়। রত্নেশ্বরতন্ত্রে আবার লিখিত আছে—নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাৎ তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ। ন তীর্থগমনোপি ন চ শারীরযন্ত্রণৈঃ॥ অদীক্ষিত ব্যক্তির তপস্যা, নিয়ম, ব্রত, তীর্থগমন, শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণ না করিলে ঐ সব দৈবকার্য্য সবই পণ্ড হয়। রুদ্রযামল তন্ত্রে লিখিত আছে—উপচারসহস্রৈস্তু আদত্তং ভক্তিসংযুতং অদীক্ষিতার্পণং দেবা ন গৃহ্ণন্তি কদাচন। অর্থাৎ অদীক্ষিত ব্যক্তি যদি ভক্তিভাবে সহস্র সহস্র উপাচার দেবতাকে অর্পণ করেন, দেবতা তাহা কদাচ গ্রহণ করেন না। এখন প্রশ্ন আসিতে পারে—শাস্ত্র কি নির্ম্মম, কি কঠোর? অদীক্ষিত ব্যক্তি যদি সহস্র সহস্র উপাচার লইয়া ভক্তিভাবে দেবদ্বারে উপনীত হন, দেবতা তাহা গ্রহণ করিবেন না। ইহা কেমন দেবতা, ইহা কেমন শাস্ত্র! ইহার উত্তরে বলা যায়—ওগো, দেবতা ঠিক দেবতা, শাস্ত্রও যথার্থ শাস্ত্র, পূর্ণ নিয়মানুবর্ত্তিতা;

তুমি বুঝ্‌তে পারছ না তাই অসন্তুষ্ট হচ্ছ। স্থির হ'য়ে শোন—অজ্ঞেয় দেবতা, যাঁর সঙ্গে তোমার আত্মীয়তা স্থাপিত হয় নাই, কোন্ বিশ্বাসে উৎকৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে গিয়ে দেবতাকে অর্পণ করছ-দেবতা যে উহা গ্রহণ করেন তার প্রমাণ, তুমি ত প্রত্যক্ষ দেখ নাই যে তোমার দ্রব্যসামগ্রী দেবতা গ্রহণ করছেন বা কোনদিন গ্রহণ করেছেন। তবে কোন বিশ্বাসে তুমি তোমার ক্লেশার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করে দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করতে যাচ্ছ? তুমি বল্‌বে শাস্ত্রে লেখা আছে—দেবতাকে অর্পণ করিলে তাহা দেবতা গ্রহন করেন। শাস্ত্রই সংস্কাররূপে আমাদের ধর্ম্মে প্রেরণা দিয়া থাকেন। যে শাস্ত্রকে বিশ্বাস করে তুমি দেবতাকে কত কি উপচার দিতে ছুটেছে—যে শাস্ত্রকে বিশ্বাস করে তীর্থগমনে পুণ্যসঞ্চয় করতে ছুটেছ, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণ দানধ্যান পূজা জপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছ, সেই শাস্ত্রই যখন উদাত্তকণ্ঠে বল্‌ছেন—অদীক্ষিত ব্যক্তির ঐ অনুষ্ঠিত ঐ সমস্ত কার্য্য সবই পণ্ড হয়, দেবতা গ্রহণ করেন না, পিতৃলোক তৃপ্ত হন না, অদীক্ষিতব্যক্তির প্রদত্ত দ্রব্যসামগ্রী মলমূত্রসম পরিত্যক্ত হয়, এই যে শাস্ত্রবাক্য-গুলি অবিশ্বাস করবার কি কারণ আছে। তুমি বলছ,—ভক্তিভাবে উপাচার লইয়া দেবদ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, দেবতা কেন গ্রহণ করবেন না? আমি বলি তোমার যথার্থ ভক্তিভাবই যদি এসে থাকে তবে দীক্ষাগ্রহণে অভক্তি কেন? শাস্ত্রের খানিকটা তোমার মনের সঙ্গে লাগিল

তুমি বিশ্বাস করিলে, মানিয়া চলিলে, যেখানটী মনের সঙ্গে লাগিল না বা সুবিধা হইল না মানিলে না। শাস্ত্রই জনগণের মনকে শাসন করে থাকে। মন কখন সত্যদর্শী ঋষির শাস্ত্রকে শাসন করতে পারে না। তুমি কবিরাজের নিকট হইতে মকরধ্বজ আনিয়া সেবন করিবে স্থির করিলে, কিন্তু কবিরাজ যে অনুপান দিয়ে উহা সেবন করিতে উপদেশ দিলেন, তাহা তুমি না শুনিয়া বিনা অনুপানে মকরধ্বজ সেবন করিলে, উহাতে কি ফল হইবে বরং বিপরীত ফলই হইয়া থাকে।

মনে কর, তুমি তোমার গর্ভধারিণী মাকে একটু ভাল সন্দেশ কি একটু ছানা কিনে এনে খাওয়াইবে এইরূপ সঙ্কল্প করে, তুমি বিশেষ ভক্তিভাবে ছানা ও চিনি বা সন্দেশ তোমার মায়ের নিকট নিয়ে উপস্থিত হলে, কিন্তু তুমি জান না, তুমি গু মাড়িয়ে এসেছ পায়ে দাগ রয়েছে—যতই তুমি ভক্তিভাব দেখাও কাকুতি মিনতি কর, কাঁদকাট, তোমার মা কিছুতেই তোমার হাতের সন্দেশ খাইবেন না, বরং বলে দেবেন, আর একদিন আনিও ভাল করে পথ দেখে শুনে এস। যে নিয়মের মধ্যে দিয়ে উপস্থিত হলে দেবতা তোমার প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করবেন তোমাকে সেই নিয়মগুলি প্রতিপালন করে আসতে হবে। সুতরাং দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান করতে হবে, নতুবা সবই পণ্ড হয়ে যাবে। যদি বল ভগবানের নিকট শুচি বা অশুচি সবইত সমান, তিনি

অসীম অনন্ত। বেশ কথা, তবে তুমি ভোগ অর্পণ করতে যাচ্ছিলে কাকে? যিনি বিরাট অসীম অনন্ত তাঁর আবার ক্ষুধা তৃষ্ণা কি, তাঁর আবার প্রীতি অপ্রীতি কি? ওগো, তুম্ য্যায়সা, রাম ত্যায়সা, তুম্ ডাহিনে যাও ত ডাহিনে যায়, বামে যাওত বাম!

কেউ কেউ উপদেশ দেন—তন্ত্রমন্ত্রের কোন প্রয়োজন নেই, নাও মা, খাও মা, বলে ভক্তিভাবে ঈশ্বরকে অর্পণ কর, প্রাণ দিয়ে পূজা কর, তিনি নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। এইরূপ উপদেশ শুনতে খুবই মিষ্ট; উচ্চ অধিকারী ভিন্ন সাধারণের পক্ষে উহা কার্য্যকরী করে তোলা একেবারেই অসম্ভব। প্রথমে তন্ত্রমন্ত্রের অনুশীলন বহুদিন বহুকাল ধরে করতে হয়। বিধিপূর্ব্বক পূজা যাগ সেবা করতে করতে অভ্যাসের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে একটা আত্মীয়তা বোধ জন্মায়, প্রাণের সঙ্গে একটী পরিচয় হয়। অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা বোধ জন্মালে তখন নাও মা, খাও মা, বলে ঈশ্বরকে জোর করে খাওয়ান যায়। প্রাণদিয়ে পূজা করা মানে—পুষ্পচন্দন যেমন তাঁর চরণে অর্পণ করা হয়, সেইরূপ ভক্তিচন্দনে নিজ প্রাণটুকু তাঁর চরণে অর্পণ করতে হয়। প্রাণটুকু অর্পণ করা অর্থাৎ সমস্ত কর্ত্তৃত্বটুকু বিসর্জ্জন করা। তুমি তাঁর হয়ে গেলেই তোমার সকল আবদার তিনি শুনবেন। তখন তুমি তাঁকে নাও মা, খাও মা বলে আবদার করলেই তিনি নেবেন ও খাবেন। যতদিন তুমি ঐ উচ্চাঙ্গের অধিকারী না হ'চ্ছ, ততদিন তোমাকে

শাস্ত্রবিধি অনুসারে যথাসম্ভব নিয়মানুবর্ত্তিত পালন করে চল্‌তে হবে। অভ্যাসযোগে কর্ম্মানুশীলনের দ্বারা "তিনি" যথার্থই আছেন, এই দ্বৈতবোধ প্রথমে জাগ্রত হউক, তারপর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিবাদ ও জ্ঞানবাদ এসেই যাবে। একমাত্র তন্ত্রমন্ত্র ব্যাপারের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের দ্বারাই সাধকহৃদয়ে দ্বৈতবোধ জাগরিত হয়, দ্বিতীয় উপায় নাই, তাই সত্যদর্শী ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ তদনুকুল উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি যথার্থই আছেন, এই বিশ্বাস যখন দৃঢ় হতে থাক্‌বে, তখন সাধক তাঁর নাম উচ্চারণে, তাঁর সেবায়, তাঁর পূজায়, তাঁর ভজনে অভূত আনন্দ উপলব্ধি করবে, কতভাবেই রস আস্বাদন করবেন—তা ভাষা দিয়ে কেমন করে বোঝাব। যথার্থ দ্বৈতবোধ জাগরিত হলেই কোন কোন সাধকের প্রাণে সেবা পূজা ভজনের তীব্র অনুরাগ জন্মায়, তাতেই সাধক বিমল আনন্দ পান, রসাস্বাদ গ্রহণ করে আপ্লুত হন; ইঁহাদিগকে লোকসমাজে ভক্তিবাদী কহে। আবার কোন কোন সাধক, প্রাথমিক অনুশীলনের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বলে, দ্বৈতবোধ সুদৃঢ় হলেই "তাঁর" সঙ্গে পরিচয় ও আত্মীয়তার সৃষ্টি হলেই, অর্থাৎ এক কথায়, "ওঁ তৎসৎ" এই বোধ যথার্থ ফুট্‌লেই, মনে করেন,—আমার ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বব্যাপী, বিরাট অসীম, অনন্ত। সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। অর্থাৎ আমার ঈশ্বর সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট সর্ব্বত্র নেত্র মস্তক ও মুখবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র

শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট এবং ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রব্যাপিয়া রহিয়াছেন। সাধক এইরূপ বোধ ফুটিয়ে তুল্‌তে তুল্‌তে (এখানেও অভ্যাস-যোগ) উপলব্ধি করেন, আমার ঈশ্বর, অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম, যখন সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তখন আমাকে বাদ দিয়া তিনি অবস্থান কর্‌ছেন না। আমাকেও ব্যাপিয়া আছেন, আমার হস্ত পদ তাঁর হস্ত পদ, আমার নেত্র মস্তক মুখ মন প্রাণ যা কিছু সবই তাঁর, অর্থাৎ তিনিই'ত "আমি" সাজিয়া অবস্থান কর্‌ছেন। যে দিন এই বোধ কাহাকেও অপেক্ষা না রাখিয়া সাধকের প্রাণে স্বাধীনভাবে সত্য সত্য ফুটিয়া উঠ্‌বে—সেইদিন সাধকও আপনা আপনি বলিয়া উঠ্‌বেন—"সোঽহম্"। "সঃ" অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম, অর্থাৎ দ্বৈতবোধগুণবিশিষ্ট আমার ঈশ্বর, "অহম্"—আমি। এইখানে সাধকের দ্বৈতবোধে সমাহিত হন, ক্রমে অস্মিতাটুকুও সাধক তখন অদ্বৈতবোধে সমাহিত হন, ক্রমে অস্মিতাটুকুও ডুবে যায়, পরম ব্রহ্মে লীন হন। কেউ বা ফিরে এসে কিছু জগন্মঙ্গল কাজ করেন, আবার কেউ বা নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হ'য়ে আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। ইঁহাদিগকে সমাজে জ্ঞানবাদী কহেন।

সুতরাং কর্ম্মবাদকে উড়িয়ে দিয়ে ভক্তিবাদ বা জ্ঞানবাদের উদ্ভব হয় না। প্রথমেই আনুষ্ঠানিক কর্ম্মকাণ্ডকে বাদ দিয়ে "নাও মা, খাও মা" বলে যদি ঈশ্বর উপাসনা আরম্ভ করা যায় দু একজনকে বাদ দিয়ে প্রায় সকলেরই কাঁচা বাঁশে ঘুন ধরার

মত অবস্থা এসে যাবে! সুতরাং ঐ মিষ্ট উপদেশ অনেক উপরের কথা—সাধারণের গ্রহণীয় নহে।

এই জন্যই শ্রীসদাশিব উপদেশ দিয়াছেন—সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ক'রে সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করবে; নতুবা সবই পণ্ড হবে। অতঃ সদ্‌গুরোরাহিতা সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ। সদ্‌গুরুর লক্ষণ তন্ত্রশাস্ত্রে সুস্পষ্ট লিখিত আছে তদ্ যথা—শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ শুদ্ধান্তঃকরণস্তথা। পঞ্চ তত্ত্বাত্মকো যস্ত সদ্‌গুরুঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥ সিদ্ধোঽসাবিতি বিখ্যাতো বন্ধুভিঃ শিষ্যপালকঃ। চমৎকারী দৈবজ্ঞঃ সদ্‌গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে। অশ্রুতং শ্রুতং দেবি বাক্যং সাধু মনোহরম্। তন্ত্রমন্ত্রং সমাবেত্তি য এব সদ্‌গুরুঃ অর্থাৎ যাঁর তন্ত্রমন্ত্র বেশ ভালভাবে জানা আছে, অর্থাৎ যিনি সুপণ্ডিত, মিষ্টভাষী, দৈবশক্তিশালী ও সাধক বলিয়া যাঁর সুনাম আছে, যিনি শিষ্যের প্রতিপালক, অর্থাৎ যিনি কৌশলে শিষ্যের বিত্তাপহারী নহেন, যিনি শান্ত দান্ত তত্ত্বজ্ঞানী, তিনি সদ্‌গুরু। এই সদ্‌গুরু সকল আশ্রমেই পাওয়া যায়। গৃহস্থ কদাচ গৃহস্থ গুরু ভিন্ন অন্য আশ্রম থেকে দীক্ষিত হবে না। এইরূপ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ভিন্ন, সন্ন্যাসী সন্ন্যাস আশ্রম ভিন্ন অন্য আশ্রম থেকে দীক্ষিত হবেন না। যিনি যে আশ্রমে আছেন, যতদিন সেই আশ্রম ত্যাগ না করে অন্য আশ্রম গ্রহণ করছেন, ততদিন তাঁকে স্বীয় আশ্রমগত ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনুশাসন বিধিনিষেধগুলি মানিয়া চল্‌তেই

হবে। যিনি পরমহংসত্ব লাভ করেছেন তিনি বিধিনিষেধের অতীত, কোন অনুশাসনগণ্ডীর মধ্যে তিনি আবদ্ধ নহেন, কেহ তাঁকে আবদ্ধ করতেও পারেন না; তিনি সুখদুঃখের অতীত, মান ও অপমানপরিশূন্য, অখণ্ড আনন্দক্ষেত্রে স্থিতিবান্, তাঁর ইচ্ছাশক্তিতে বাধা পড়ে না, তিনি সমাধিস্থ ব্যক্তি।

প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ গৃহস্থ শিষ্যের পক্ষে শাস্ত্রীয় লক্ষণ মিলিয়ে গুরুনির্ব্বাচন একটী কঠিন সমস্যা। সৃষ্টজীবের মধ্যে কেহই পূর্ণ নহেন, যত উচ্চাঙ্গের সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষ হউন, কোথাও না কোথাও একটু আধটু অভাব ত্রুটী বিচ্যুতি আছেই—ইহা সাধারণ সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন। কারণ তাঁদের বুদ্ধি নির্ম্মল নহে, বুদ্ধির বহির্বিকাশই বিচার; বুদ্ধিতে ময়লা থাকলেই বিচারেও ময়লা থাকবে। কিন্তু যারা হংসজাতীয় জীব তাঁরা কোথাও দোষ-ত্রুটী বিচ্যুতি গ্রহণ করেন না; তাঁদের চক্ষে সবই আনন্দময় কাজেই দেখা যায়, সমালোচকের বুদ্ধির নির্ম্মলতার তারতম্য অনুসারে সমালোচ্য বস্তু বা ব্যক্তির নির্ম্মলতার পরিমাণ নিরূপিত হ'য়ে থাকে।

সাধারণ গৃহস্থ শিষ্যের পক্ষে গুরু-নির্ব্বাচন ব্যাপারে ইহাই সিদ্ধান্ত করা যায়—সন্দেহদোলায়মান বুদ্ধিকে মঙ্গলময় পথে চালিত করবার জন্য চঞ্চল বুদ্ধিকে দিগ্‌দর্শন করিয়ে দেবার জন্য, শাস্ত্রের উদ্ভব। সত্যদর্শী ঋষিগণ জগতের কল্যাণের জন্যই শাস্ত্রপ্রণয়ন করে গেছেন। সেখানে পক্ষপাতিতা নাই।

যিনি দীক্ষা গ্রহণ কর্‌বেন, তাঁর বিচারে যিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞানী তাঁর নিকট থেকে গুরুনির্ব্বাচনের লক্ষণগুলি জেনে নেবেন। ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁকে দেখে ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মাবে, তাঁকেই গুরুত্বে বরণ কর্‌বেন। শাস্ত্রের বিধিনিষেধ সকলেই সম্যক্‌রূপে জানেন না এবং কোন যুগেও সকলে জানে না। সাধারণ লোকেরা শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের নিকট শাস্ত্র বিষয় জানিয়া লইবেন, এখনও অনেকে লইয়া থাকেন। শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্যক্তিবিশেষের প্রতি তোমার সন্দেহ থাকে, বিভিন্ন স্থানে জানিয়া লও। ব্যাধি একটু কঠিন হলে, বহু চিকিৎসকের অনুসন্ধান করে থাক; প্রকৃত শাস্ত্রমত জান্‌বার জন্য নয় দু'চার স্থানে অনুসন্ধান কর্‌লে, তাতে ক্ষতি কি?

শাস্ত্রীয় লক্ষণ জানা যদি তোমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয়, হে গুরুকরণাভিলাষি গৃহস্থ! অনুরাগের পারঘাটে গিয়ে চল্‌তি নৌকায় উঠে পার হয়ে যাও,—কেবল লক্ষ্য রেখো, নৌকার মাঝি গৃহস্থ কিনা, সাধক কিনা, নির্লোভ কিনা এবং স্ববৃত্তিতে আছেন কিনা? সত্বর উঠে পড়, কালবিলম্ব ক'র না। গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ। যমরাজ এসে চুলের ঝুঁটি ধরে টান্‌ছেন, আর সময় নাই, এই সময় কিছু করে নাও। নতুবা প্রত্যেক নৌকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, হাল, কাঠ, পেরেক, পরীক্ষা করে পার হতে হলে, এ জীবনে আয়ুঃসূর্য্য অস্ত যাবে, পার হওয়া

ঘটে উঠবে না। চিকিৎসাশাস্ত্র তুমি জান না, ওকালতি তুমি বোঝ না, কিন্তু সুচিকিৎসকের বা বিজ্ঞ উকিলের তোমার প্রয়োজন হলে, তুমি নিজ মনোমত তাহা পেয়ে থাক। আমার বিশ্বাস যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তুমি চেষ্টা করলে ঐরূপ সদ্‌গুরুও লাভ করতে পারবে।

অনেকে বলে থাকেন—বহু চেষ্টা করেও মনের মত গুরু পেলাম না, কাজেই দীক্ষা লওয়া হ'ল না। আমি বলি,—সত্যকার প্রাণ দিয়ে শ্রীগুরুর অনুসন্ধান করা হয়নি। তাহার উত্তরে তাঁরা বলেন,—সত্য সত্যই বহু স্থানে শ্রীগুরুর অনুসন্ধান করা হয়েছে, সর্ব্বত্রই গলদ। আমি ইহার উত্তরে বলে থাকি, এতবড় ভারতবর্ষে যদি ব্যক্তিবিশেষের গুরু না পাওয়া যায়, তিনি নিশ্চয়ই অদ্বিতীয়, তিনি নিজেই জগদ্‌গুরু, তাঁর আর শিষ্য হয়ে সাধন ভজনের প্রয়োজন কি? আবার অনেকে বলেন,—গুরু আপনা হতে যখন আস্‌বেন, তখন আমি দীক্ষা নেব। শ্রীগুরুর যখন কৃপা হবে, তখন আপনা হতেই সব হয়ে যাবে।

ওগো বিনয়প্রচ্ছদে ঢাকা কর্তৃত্ববিলাসি জীব! ঐরূপ দৃঢ়বিশ্বাস উৎপন্ন হলে তোমার গুরু নিশ্চয়ই আপনা হতে আস্‌বেন; কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন যাতে হয়, তদনুকূল কি অনুশীলন কর্‌ছ? তোমার স্ত্রীর অসুখ হলে কৈ চুপ করে বসে থাক না ত', কৈ তোমার বিশ্বাস বলে ডাক্তার সাহেব আপনা হ'তে আসেন না ত'; দীক্ষা গ্রহণে যেমন নির্ভর করে

বসে আছ, স্ত্রীর চিকিৎসাবিষয়ে ঐ ভাবে বসে থাকো না ত'। দিনরাত্রি ছুটাছুটি করছ কেন।

বিনয়ের অভিনয়ে ভক্ত সাজা যায় বটে, তাতে স্ত্রীর রোগ ভাল হয় না,—তাই তোমাকে ছুটাছুটি করতে হ'য়েছে। ওগো বিনা আহ্বানে দেবদেবী হতে কুকুর শৃগাল কেউ আসে না, বিনা আকর্ষণে একটি তৃণ পর্য্যন্ত কেন্দ্রমুখী হয়না, আর তোমার বিনা আহ্বানে বিনা প্রাণের টানে শ্রীগুরুদেব কেন আস্‌বেন? পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র, যাঁকে অবতার বলে এখনও প্রত্যেক হিন্দুসন্তান নতমস্তকে প্রণতি জানিয়ে থাকেন, রাবণবধের জন্য তিনিও মহাশক্তির আরাধনায় উপদিষ্ট হয়েছিলেন, তাঁকেও করযোড়ে আহ্বান করতে হয়েছিল, প্রাণের কাকুতি জানাতে হয়েছিল, অকালে বোধন করতে হয়েছিল, তবে দেবী এসেছিলেন; ওগো! বিনা আহ্বানে বিনা আকর্ষণে কেউ আসে নাই, এপর্য্যন্ত কেউ আসেনি। ঐ ভাবেই বিমুখ হ'য়ে পণ্ডিত সেজে বসে থাকলে, তোমার গুরুদেব আস্‌বেন না, দম্ভের ফ্রেমে আঁটা কর্ত্তৃত্বাভিমানের কাঁচলাগান চশমাটী দূরে ফেলে দাও, জয় করুনাময় শ্রীগুরু বলে চোখ মেলে তাকাও,—ঐ দেখ তোমার শ্রীগুরুদেব তোমারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে যত্ন করে তাঁর চরণযুগল তোমার বুকে তুলে নাও, শান্তি পাবে। হয়ত প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের মত তোমারও সৌভাগ্য হতে পারে, তুমিও হয়'ত একদিন তাঁর ভাবায় বল্‌বে—"যাঁহা যাঁহা আঁখি জুড়ে, সব গুরুময় দেখি।"

"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" অর্থাৎ শুভকর্ম্মে বহু বিঘ্ন ও বহু অন্তরায়। সুতরাং কালবিলম্ব না ক'রে, হে গৃহস্থ ভক্ত, সত্বর দীক্ষা গ্রহণ কর। দীক্ষা গ্রহণ যে কোন সময়ে হতে পারে। কোন কালাকাল বিচার করতে হয় না—শ্রীগুরুদেব দয়া ক'রে যেদিন যে সময় ইচ্ছা করবেন—সেই দিন, সেই সময়েই দীক্ষার প্রশস্ত সময়। দীক্ষিত হলেই তোমাকে সব ছেড়ে সন্ন্যাস নিতে হবে না। পশ্চাৎ শক্তিপ্রবাহ না থাক্‌লে, সংসারসমুদ্রে পাড়ি দিতে পারবে না। সত্যকার তাজা মানুষ হ'য়ে বেঁচে থাক্‌বার জন্য দীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ছত্রপতি শিবাজীর ইতিহাস পাঠ কর, মহাপুরুষগণের জীবনী অনুশীলন কর এবং হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ অনুভব কর। তাহলে দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরও ভালভাবে বুঝ্‌তে পারবে। দীক্ষাগ্রহণ জীবের বোধনোৎসব। তারপর পূজা। পূজাশেষে বিসর্জ্জন। গুণভেদে পূজা ত্রিবিধ। তামসিক, রাজসিক ও সাত্বিক। তন্ত্রমতে ঐ তিনটি পূজা, পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব বলিয়া বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বের যতকিছু কর্ম্মপ্রবাহ তামসিক, রাজসিক ও সাত্বিক—এই ভাবত্রয়েরই বহির্বিকাশ। প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক বৃক্ষলতা, প্রত্যেক খাদ্যসামগ্রী—এক কথায় পঞ্চভূতাত্মক যাবতীয় পদার্থ ঐ তামসিক, রাজসিক ও সাত্বিক —এই তিনটী গুণে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। তিনটী গুণ কোথাও সমানভাবে নাই, সৃষ্টিতত্ত্বে তাহা থাক্‌তে পারে না, দুইটী বস্তু সর্ব্বতোভাবে এক হয় না, কোথাও না, কোথাও

কিছু না কিছু ভেদ থাকবেই। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ অসংখ্যগুণভেদে ইহার অসংখ্য রূপভেদ। প্রত্যেক বস্তুতে ঐ তিনটী গুণই সমানভাবে থাকবে। তার মধ্যে একটি না একটী প্রাধান্য লাভ করে থাকে। তমোগুণ যাহার প্রধান, তিনি তামসিক জীব; তাঁর পূজা, আহার বিহার, সাধন-ভজন সবই তমঃপ্রধান, তবে রাজসিক ও সাত্ত্বিক ভাব যে মোটেই তাঁর মধ্যে নাই, তাহা নহে। তমোভাব প্রাধান্য-লাভ করে রজোভাব বা সত্ত্বভাবকে দাবিয়া রাখিয়াছে! ইহাই পশুভাবের লক্ষণ। এইরূপ রজোগুণ; যাঁহার মধ্যে ইহা অন্য ভাবকে দাবিয়া প্রাধান্য করেছে—তিনি রাজসিক জীব; তাঁর ভাব বীরভাব। এইরূপ সত্ত্বগুণ যাঁহার মধ্যে রজঃ ও তমঃ ভাবকে দাবিয়া প্রাধান্যলাভ করেছে তিনি সাত্ত্বিক জীব ও তাঁর ভাব "দিব্যভাব"। এই তিনটী ভাবেই পূজা হয়ে থাকে।—ঈশ্বর সকল ভাবের পূজা গ্রহণ করে থাকেন। পশুভাবের বহির্মুখ যেদিন বীরভাবের অন্তর্মুখের সঙ্গে মিলিত হয়, সেদিন পশুভাব বীরভাবে পরিণত হয়। আবার বীরভাবের বহির্মুখ যে দিন দিব্যভাবের অন্তর্মুখের সঙ্গে মিলিত হয়, সেইদিন বীরভাব দিব্যভাবে পরিণত হয়। 'দিব্যভাবের পূজা যেদিন ঠিক ঠিক হয়ে যায়, সেইদিন পূজা শেষ হয়। তারপরই বিসর্জ্জন। ভাব্যভাবুকয়োঃ একবৃত্তিঃ। অখণ্ড আনন্দসত্তায় নিজেকে হারিয়ে ফেলা।

দীক্ষাগ্রহণের পর যাঁরা একটু জন্মান্তরের সুসংস্কারবশে সাধনপথে অগ্রসর হতে চান, যদি দীক্ষাগুরু দেহরক্ষা ক'রে থাকেন, কোন সদ্‌গুরুর চরণতলে বসে তাঁহাদিগকে শিক্ষা গ্রহণ কর্‌তে হবে। পুস্তক দেখিয়া সাধক হওয়া যায় না—তাহাতে বরং বিপদই আছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রের মতই একটীর পর একটী গুরূপদেশ গ্রহণ কর্‌তে হবে। যাঁদের জীবন কর্ম্ম-বহুল, তাঁরাও তাঁদের দৈনন্দিন কর্ম্মের ভিতর দিয়ে সংক্ষিপ্ত উপায়ে সাধন-সোপানে কিছু কিছু অগ্রসর হ'তে পারেন। অনুরাগ থাক্‌লে সবই হয়। প্রয়োজনের তীব্রতা বোধ হলেই সুবহুল কর্ম্মজীবনেও কিছু না কিছু সময় পাওয়া যায়।

গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস।

অনেকেরই মুখে শোনা যায়—সংসার ছেড়ে না দিলে ঠিক ঠিক ঈশ্বর উপাসনা হতে পারে না, হৈচৈর মধ্যে মনঃস্থির হয় না। সুতরাং দীক্ষা নিয়ে গুরুকরণ করে লাভ কি; সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সময় কোথায় যে তাঁকে ডাক্‌ব? যদি কোন দিন সংসার ত্যাগ করতে পারি তখন দেখা যাবে।

আদর্শভ্রষ্ট হলে সমাজের মুখে ঐসব মন্তব্য বাহির হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কোন জীব আদর্শভ্রষ্ট হয়ে নেমে এলে, সে

উপরের কথা আর ভাব্‌তে পারে না, যুক্তি ও তর্ক-সিদ্ধান্ত তার মস্তিষ্কে আর স্থান পায় না। সেই জীব যেখানে নেমে গেছে সেই নিম্নভূমির নিয়ত সংসর্গে, তার মনের মধ্যে যে ধারণা বা সংস্কার বদ্ধমূল হয়, তার উচ্ছেদ সাধন করা, সব ক্ষেত্রে সব সময় সম্ভবও হয় না। তবে যাঁরা উচ্চসংস্কারের জীব, তাঁরা ময়লা মাটীতে ঢাকা পড়া স্বর্ণকুম্ভের ন্যায় সাংসারিক মালিন্যের দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও একটুকু মাজাঘসার দ্বারাই পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হন।

সনাতন ধর্ম্মের যাঁরা প্রযোজক, অর্থাৎ যাঁদের অনুভূতি প্রসূত মুখের বাণী সংগৃহীত হয়ে বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরান স্মৃতি, গৃহ্য-সংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রস্তুত হয়েছে, তাঁরা প্রায় সকলেই যে সত্যদর্শী গৃহস্থ। তাঁরা স্ত্রী-পুত্র, কন্যা, শিষ্য ভক্তগণের মধ্যেই সত্যদর্শন করে আত্মসম্বেদন লাভ করেছিলেন। সেই গার্হস্থ্যধর্ম্মাবলম্বী মুনি ও ঋষিগণের মুখের বাণীই আজও সনাতন ধর্ম্মের পরিচালক। অতীতে বা বর্ত্তমান যুগে যিনি যত বড়ই মহাপুরুষ হয়েছেন, যিনি যতই সত্যের নিকটবর্ত্তী হয়েছেন সকলকেই ঐ পুত্রকলত্রাদি পরিবেষ্টিত সত্যদর্শী ঋষিগণের প্রদর্শিত বিধিনিষেধের দ্বারা অনুশাসিত হয়ে, তাঁদের প্রবর্ত্তিত পথেই চল্‌তে হয়েছে।

শতপুত্রের পিতা বশিষ্টদেব যখন অযোধ্যার রাজসভায় উপবিষ্ট হয়ে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহর্ষিগণের সম্মুখে গার্হস্থ্যধর্ম্মে বীতস্পৃহ অস্বাভাবিকবৈরাগ্যভাবাপন্ন তরুণ

শ্রীরামচন্দ্রকে যোগশাস্ত্র (যাহা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ) শ্রবণ করাইলেন, কেবলমাত্র শ্রবণ করাইলেন না, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে অভ্রান্ত যুক্তিতর্কের দ্বারা বৈরাগ্যভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মে অনুপ্রাণীত করলেন তখন সেই বশিষ্ঠদেব অন্যান্য নৃপতিকর্ত্তৃক বহু প্রশংসিত হয়ে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন—হে ভগবন!—আপনি শতপুত্রের পিতা হয়ে পূর্ণ হৈ চৈএর মধ্যে এমন অপূর্ব্ব যোগশাস্ত্র কেমন করে আয়ত্ত করলেন, আপনি দয়া করিয়া বলুন। বশিষ্ঠদেব সহাস্যবদনে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন—তৎজানাতি মে অরুন্ধতি অর্থাৎ আমার মহাশক্তি স্বরূপিণী সতী অরুন্ধতীদেবী জানেন কেমন করে আমি এই যোগশাস্ত্র আয়ত্ত করেছি। বশিষ্ঠদেব যেন তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে গৌরব বোধ করলেন,—অগণিত লোকারণ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে অকুণ্ঠ-ভাষায় স্বীকার করলেন—এত বড় যোগশাস্ত্র প্রণয়নে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই, কৃতিত্ব আমার দেবী অরুন্ধতীর। আহা! কি গভীর দাম্পত্যপ্রেম। যদেতদ্ধ দয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। এই মন্ত্রের কি চরম পরিণতি! এইজন্য আজও বিবাহ-কর্ম্মাদি হোমে দম্পত্তির মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার কামনায় ঐপতিপ্রাণা আদর্শ সতী অরুন্ধতী-দর্শনের ব্যবস্থা আছে, তদনুকূল মন্ত্রও আছে। ওগো, তোমাদের এতটুকু কৃতিত্ব এতটুকু বাহাদুরী, তোমাদের স্ত্রীকে নিতে দাও না।

তোমার বিনা অনুমতিতে তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী—তোমার বংশধরের জননী, একটা জীর্ণ বস্ত্র ও একটী তাম্রমুদ্রা স্বাধীনভাবে কাহাকেও দিতে পায় না। তুমি স্বামী হয়েছ, পতি পরমগুরু হয়েই সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়েছ, স্ত্রীর উপর যা ইচ্ছা তাই করতে পার বলে কারণে অকারণে দম্ভ প্রকাশ করে থাক। স্ত্রীর মাতাপিতার কুৎসা করে তার প্রাণে নিদারুণ ব্যথা দিয়ে তুমি বা তোমার মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনেকেই আনন্দ লাভ করে থাক। ধর্ম্মপত্নীর মাতাপিতার ত্রুটী বিচ্যুতি আবিষ্কার করে জীবনের চরম কৃতিত্ব দেখিয়েও থাকো। অথচ তোমায় সমস্ত অন্তরটুকু খুলে সোজা হয়ে একদিন তার সম্মুখে দাঁড়াতে সাহস কর না। আবার সেই তুমি বাক্যবীর হয়ে নারীপ্রগতির ভ্রান্তপথে বড় বড় আমদানী বুলি তুবড়ীর মত ছাড়। তুমি কেমন করে সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ বুঝবে? চারিটী আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য শ্রেষ্ঠ আশ্রম—ইহাই বা কেমন করে অনুভব করবে?, গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রাণশক্তি নারী বা কুমারীপূজা ও সধবাপূজা, এখনও আমাদের দেশে কিছু কিছু প্রচলিত আছে—কিন্তু তাহা প্রাণহীন। বিবাহের নিখুঁত যৌতুকপ্রদানে অসমর্থ মাতাপিতার ত্রুটিবিচ্যুতির নিন্দা শুনতে শুনতে ক্ষতবিক্ষতহৃদয় নববধূ চলেছেন—স্বামীর সঙ্গে প্রথম মিলনের ক্ষেত্রে—ফুলশয্যায়। ফুলশয্যার কিগভীর উদ্দেশ্য ছিল! ইহা কুসুমকোমল তুটী নবীন প্রানের প্রথম মিলনক্ষেত্র: ঐ প্রাণতুটিকে পারিপার্শ্বিক চিন্তাজাল থেকে বিচ্ছিন্ন

করে, অর্থাৎ সব ভুলিয়ে সম্পূর্ণ উৎফুল্ল করে তোলবার জন্য সুগন্ধি বনকুসুমাস্তীর্ণ শয্যা, ফুল্লকুসুমবাসিত গৃহ এবং কৌতুক-প্রিয় মদবিহ্বল সখীগণের মৃদুপদক্ষেপ। অহো! দুটী প্রাণকে মিলিত করবার কি অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী আয়োজন। কিন্তু মিলন কোথায়!—আনন্দ কোথায়!—যে পিতামাতার স্নেহনীড়ে নববধূ এতদিন কাটিয়ে এসেছেন, যে পিতামাতার ত্যাগ তিতিক্ষায় এতদিন পরিবর্দ্ধিত হয়ে এসেছেন, হয়ত কত দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে এসেছেন, আজ স্বামীর গৃহে প্রভুর সংসারে পরমদেবতার সংসর্গে এসে তাঁর নিরীহ পিতা মাতার নিন্দা শুনছেন ও অন্তরের অন্তর তাঁর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। কুসুমাস্তীর্ণ শয্যা দিয়ে তাঁর প্রাণকে উৎফুল্ল করতে পারবে না এবং দেবভোগ্য আহারে তাঁর তৃপ্তি হবে না। অতৃপ্তির বীজ নারীহৃদয়ে একবার অঙ্কুরিত হ'লে, তাতে একদিন না একদিন অশান্তির ফল ফলবেই। পিতামাতার নিন্দা থাকলেও, সে নিন্দা কন্যা শুনতে চায় না। পিতামাতার নিন্দা কন্যা শুনলে কি নিদারুণ ব্যথা তার প্রাণে বাজে, তার স্বামী শত চেষ্টা করে তা' বুঝতে পারবে না। আজ হিন্দুর প্রায় ঘরে ঘরে এই ভাবে নারী নির্য্যাতন হচ্ছে। যে সংসারে নারী নির্য্যাতিত হয়, নারীর চোখে জল পড়ে, গুরুনিন্দা হয়, সেখানে সৎপুত্রের আবির্ভাব হয় না, দীর্ঘজীবি বিদ্বান্ ও ভক্তিমান্ পুত্র এসে জন্মগ্রহণ করে না। "শুচীনাং শ্রীমতাম্ গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে"। দেশের

উন্নতি যদি চাও, দম্ভের আবেষ্টনীতে নিজেকে ঢেকে স্ত্রীর উপর অযথা কর্ত্তৃত্ব চালিও না, প্রকৃত স্বামীর গুণ সহনশীলতা অর্জ্জন করে স্বামী হও ও গুরুত্ব অর্জ্জন করে গতি গরম গুরু হও। আজ এই সহজ কথাগুলি তোমাদের বল্‌তে হচ্ছে,—তার প্রধান কারণ—মানুষ তৈরীকরার কারখানা আমাদের দেশ থেকে উঠে গেছে। তাই আজ দেশে এত দুর্দ্দিন। এখন যে দেখছ—শত শত কারখানায় শিল্প-বাণিজ্যের দ্রব্য-সম্ভার প্রস্তুত হচ্ছে, শত শত ধনী লোক ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য ছুটোছুটী কর্‌ছে, পূর্ব্বে ঠিক ঐরূপ প্রতিগ্রামে, প্রান্তরে, নদীর তীরে, পর্ব্বত শিখরে, অথবা বনানীর বুকে শত শত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমরূপ মানুষ তৈরীর কারখানা ছিল। তার কর্ম্মকার ছিলেন—পরহিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ আদর্শ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, শত শত রাজা মহারাজা ও ধনী উহার রক্ষার জন্য ছুটোছুটী কর্‌তেন। সে আশ্রমে সর্ব্ববিধ আরহাওয়ার মধ্যে রাজপুত্র হ'তে কাঙ্গালপুত্র পর্য্যন্ত সকলেই শারীরিক, মানসিক, নৈতিক-শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে তাজা সত্যকার মানুষ তৈরী হ'ত। ঠিক খাঁটী ইস্পাতের মত—ময়লা-মাটি কাটিয়ে এমন একস্থানে এসে তারা দাঁড়াত যে, যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে কামান দাগ্‌তে পার্‌ত', শত্রুশিরঃ নিয়ে ভাটা খেল্‌ত, রা- সিংহাসনে বসে ন্যায়ধর্ম্মে রাজ্যশাসন কর্‌তে পার্‌ত, আবার এক কথায় তাহা ত্যাগ করে বনবাসে গিয়ে গৈরিক বসন পরে ফলমূল খেয়ে জীবন কাটাতে পার্‌ত। গার্হস্থ্যধর্ম্মে প্রবেশ করে সত্যকার

পতি পরম গুরু হ'তে পারত এবং স্বামিত্বের প্রেমচ্ছত্রতলে মনোবৃত্ত্যনুসারিণী স্ত্রী ও দীর্ঘজীবী সুসন্তানকে স্থান দিয়ে পরম সুখলাভ করতে পারত। কিন্তু আজ সে কারখানা প্রলয়-ভূমিকম্পে নিশ্চিহ্ন। তাই আজ ধর্ম্মে, কর্ম্মে, গৃহে, বাহিরে দেবসেবায়, সমাজে, দেশের নেতৃত্বে, গুরু ও শিষ্যে, যজমানে পুরোহিতে, স্বামী স্ত্রীতে, সাধু ও পরিব্রাজকে প্রায় সর্ব্বত্র ব্যভিচার-কীট প্রবেশ করেছে। তাই বলি, গৃহস্থ, ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রের এই দুর্দ্দিনে তুমি যদি নিজগৃহে ঐরূপ কারখানা তৈরী করে একটু খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে পার, কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার অধিকার কত সুবিস্তৃত, এবং সনাতন ধর্ম্মের তুমি সার্ব্বভৌম অধীশ্বর, একবার যদি বুঝে নিতে পার, আবার দেশের ও দশের ধর্ম্মের অবস্থা ফিরে আসবে। গৃহস্থ বড় না হ'লে দেশ বড় হবে না, সাধু সন্ন্যাসীতে দেশ ভরে গেলেও দেশ বড় হবে না। জন-সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লেও দেশ বড় হবে না; দেশ বড় হবে ধর্ম্মের উন্নতি হ'লে,—হে গৃহস্থ, যেদিন তোমরা স্বামী স্ত্রীতে নৈতিক বলে বলীয়ান্ হয়ে প্রকৃত দাম্পত্য প্রেমের আস্বাদগ্রহণ করতে সমর্থ হবে, সেদিনই দেশ বড় হবে। সৎ পিতামাতা না হ'লে, সুসন্তান জন্মায় না ও সুসন্তান না জন্মালে দেশ কোন দিনই বড় হবে না

অনেকেই মনে করেন—একটা গেরুয়া পরে ফেলে স্বামীজি হতে পারলেই—ধর্ম্মের পরম উৎকর্ষ সাধন করা হবে। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ সন্ন্যাসী হওয়া সহজসাধ্য নহে;

ব্যাসপুত্র শুকদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের কাহিনী শুন, তাহলে অনেকটা ধারণা কর্‌তে পার্‌বে।

একদিন শুকদেব তাঁর পিতা ব্যাসদেবের নিকট সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের অনুমতি চাইলেন। শ্রীব্যাসদেব বল্‌লেন—বৎস, তুমি এখনও সন্ন্যাসগ্রহণের উপযুক্ত হও নাই। তুমি মনে কর্‌তে পার আমি পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হ'য়ে তোমাকে সন্ন্যাস গ্রহণে বাধা দিচ্ছি। কিন্তু তা নয়, এই জন্য আমি স্থির করেছি, এবং আদেশ দিচ্ছি—তুমি আমার যজমান রাজর্ষি জনকের নিকট গমন কর—তিনি তোমাকে সন্ন্যাসগ্রহণে উপযুক্ত মনে করে অনুমতি দিলেই আমারও অনুমতি দেওয়া হবে। এ ঘটনা অনেকেই জানেন। শুকদেব মিথিলা গমনে প্রস্তুত হলেন। তিনি তপোবলে আকাশপথে মিথিলায় উপস্থিত হবেন সঙ্কল্প করেছিলেন। কিন্তু শ্রীব্যাসদেব তাহাকে মায়িকজগতের ভিতর দিয়া পদব্রজেই মিথিলায় গমন কর্‌তে উপদেশ দিয়েছিলেন।—শুকদেব পিতার আদেশে বহুজনপদ অতিক্রম করে বহুসংসর্গের মধ্য দিয়ে মিথিলার রাজদ্বারে উপস্থিত হলেন। শুকদেবের আগমন-বার্ত্তা রাজর্ষি জনকের নিকট প্রতিহারী জানাইয়া দিলেন। রাজর্ষি জনকের চিত্ত এতই বিশুদ্ধ ছিল যে শুকদেবের আগমনের উদ্দেশ্য তাহার নির্ম্মল চিৎক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ প্রতি-ভাত হইল। যাঁরা অতি উচ্চাঙ্গের সাধক, তাঁদের ধীক্ষেত্র এতই নির্ম্মল, এতই স্বচ্ছ—তাঁরা ইচ্ছা কর্‌লেই

ভূতভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের যাবতীয় ঘটনা ও উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ চিত্রের মত দেখ্‌তে পান। এইরূপ দেখ্‌তে পাওয়া যায় বলেই ব্যাসবাল্মিকি প্রভৃতি মুনিগণ মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করতে পেরেছিলেন। যাঁরা ঐ পবিত্র গ্রন্থগুলি কল্পনা-প্রসূত বলে থাকেন, তাঁরা যদি কোনদিন সৌভাগ্যবশে সাধনসোপানে আরোহন করেন, এবং ঐরূপ বিশুদ্ধ ধীক্ষেত্রের অন্ততঃ কাছাকাছিও উপস্থিত হতে পারেন, তাহলে তাঁদের ঐ ভ্রান্তধারণা দূরীভূত হ'তে পারে ; নতুবা অন্য দিক্ দিয়ে তাঁদের বোঝাবার কিছু নাই। তর্কযুক্তি দিয়ে অন্ধকে পুত্রমুখদর্শনের আনন্দ কেমন করে বোঝান যাবে ? যাক্ সে অন্য কথা।

শুকদেবের আগমনবার্ত্তা অবগত হয়েই ত্রিকালদর্শী জনক তাঁর উদ্দেশ্য বুঝেই তাঁর সহিষ্ণুতা পরীক্ষার জন্য প্রতিহারীকে বল্‌লেন—যাও প্রতিহারীন, তাঁকে বল্‌বে, আমি এক সপ্তাহ পরে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌বো ; বিশেষ প্রয়োজন থাক্‌লে, তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। তাঁর সেবাশুশ্রূষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখ্‌বে।

সপ্তাহ অতীত হ'ল ; প্রতিহারী পুনরায় রাজসমীপে উপস্থিত হয়ে জানালেন,—শ্রীশুকদেব আপনার দর্শনপ্রার্থী হয়ে এখনও অপেক্ষা কর্‌ছেন। এক্ষণে আপনার কি আদেশ হয়। ব্রহ্মজ্ঞ জনক শুকদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের সর্ব্বপ্রথম গুণ সহিষ্ণুতা পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হলেন, এবং মনে মনে তাঁর

জিতেন্দ্রিয়তা পরীক্ষার সঙ্কল্প কর্‌লেন। প্রতিহারীকে বলিয়া দিলেন,—কোন কারণে শুকদেবকে আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা কর্‌তে হবে ; তুমি শুকদেবকে সসম্মানে আমার সর্ব্বমনোহর প্রমোদ উদ্যানে লইয়া গিয়া বাসস্থান দিও ; সুচতুর ষোলটী বারবিলাসিনীকে আদেশ দাও, তাঁরা অহোরাত্র পর্য্যায়ক্রমে নৃত্যগীতও ভাবভঙ্গিমার দ্বারা যুবক শুকদেবকে যেন আপ্যায়িত করেন। প্রতিহারী রাজার আদেশমত পরিপূর্ণ ব্যবস্থা কর্‌লেন। শুকদেব সপ্তাহক্যাল এই সমস্ত যুবতীর মধ্যে অহোরাত্র এক শয্যায় থাক্‌লেন, একটুও বিচলিত হলেন না, নিয়মিত ব্রহ্মসাধনা, প্রাণায়াম, ন্যাসজপ, ধ্যান অনন্তচিত্ত হয়ে চালিয়ে গেলেন ; যুবতীগণকে জড়প্রস্তরপুত্তলিকা মনে করে কোথাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন না।

প্রতিহারী এই সংবাদ রাজা জনককে জানিয়ে দিলেন। রাজা জনক শুকদেবকে সসম্মানে নিজ সমীপে আনাইয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা কর্‌লেন। করযোড়ে প্রার্থনা কর্‌লেন,—হে ব্যাসপুত্র, আপনি এখন আমার প্রতি কি আদেশ করেন ? শুকদেব একপক্ষ বিলম্বজনিত কোনরূপ ক্ষোভ না দেখিয়ে শান্তভাবে নিজের ও পিতার অভিপ্রায় জানালেন। মহাযোগী জনক বল্‌লেন—আগামী প্রাতে আমরা উভয়ে যোগাসনে বস্‌বো। আপনি কিরূপ উন্নতযোগী হয়েছেন, তাহা দেখে আপনাকে আবার মন্তব্য জানাব। মহাত্মা জনক মনে মনে ঠিক কর্‌লেন—শুকদেব সন্ন্যাসগ্রহণের প্রায় উপযুক্তই হয়েছেন,

কিন্তু পাছে সন্ন্যাসগ্রহণ করে পুনরায় মায়িকজগতে আকৃষ্ট হন,—স্থির ধীবৃত্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন— এজন্য আরও একটু পরীক্ষার প্রয়োজন। অবশ্য সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ সবই জানতেন, তথাপি লোকশিক্ষার জন্য তাঁকে সাধারণ ব্যক্তির মত ব্যবস্থা করতে হ'ল।

পরদিন প্রাতে উভয়ে যোগাসনে বস্‌লেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চল্‌তে লাগিল ; নিমিলিতনয়নে দুটী মহাযোগী উপবিষ্ট, বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য, নীরব ও নিস্পন্দ। হঠাৎ এরূপ সময়ে যোগাসনের চতুর্দ্দিকে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ভান উপস্থিত হ'ল। মনে হল,—যেন সমগ্র মিথিলাপুরী দাউ দাউ করে জ্বলতে আরম্ভ করেছে, অগণিত নরনারী, প্রাণ বাঁচাও, প্রাণ বাঁচাও, কে কোথায় আছ, রক্ষা কর, রক্ষা কর বলে করুণ চীৎকার-ধ্বনি করছে। রুদ্ধবায়ুর আবেষ্টনী ভেদ করে ঐ করুণ চীৎকারধ্বনি, ঐ আকুল প্রার্থনা, মহাযোগী শুকদেবের কোমল প্রাণে প্রবেশ করল। যোগাসন টলিল, জীবের প্রাণ বাঁচাতে শুকদেব ছুট্‌লেন। গিয়া দেখলেন—একটা তৃণস্তূপে অগ্নিসংযোগে কতকগুলি লোক অভিনয় করছে মাত্র। তীক্ষ্ণধী শুকদেব তখন সমস্তই বুঝ্‌তে পার্‌লেন।

এদিকে মহাপ্রাজ্ঞ জনকের ধীরে ধীরে ধ্যানভঙ্গ হতে লাগ্‌ল। অভিনয় থামিয়া গেল, সবই নীরব নিশ্চল। তখন রাজর্ষি জনক, শুকদেবকে সস্নেহে ডাকিয়া বল্‌লেন—

বৎস্য, আমার মন্তব্য শ্রবণ কর, এবং তোমার পিতৃদেবের শ্রীচরণে অবগত করিও। সন্ন্যাসগ্রহণে এখনও তোমার সামান্য কিছু বিলম্ব আছে। এখনও তুমি মায়িক জগতের আকর্ষণ সম্পূর্ণ ছিন্ন ক'রে, সহস্রারের ভেদ করে পরমব্রহ্মে অবস্থান করবার অভ্যাসপটু হও নাই, এখনও তোমার জন্মজন্মান্তরের মায়িক আসক্তি, করুণ আর্ত্তনাদে, তোমার স্থিরধীবৃত্তিকে চঞ্চল করে তোলে। আরও কিছুদিন অভ্যাস কর; তোমার ন্যাস অভ্যাস হয়েছে। নি+আস=ন্যাস অর্থে নিক্ষেপ, যে কোন বৃত্তিকে নিক্ষেপ করবার সামর্থ অর্জ্জন করেছ; কিন্তু সম্পূর্ণ অর্জ্জন করতে পার নাই, আরও কিছুদিনের অভ্যাসে উহা সম্পূর্ণ অর্জ্জিত হবে, তখনই প্রকৃত সন্ন্যাস এসে দেখা যাবে।

উক্ত উপাখ্যান থেকে আমরা দেখ্তে পাই—পৌরাণিক যুগে সন্ন্যাসযোগ অতি দুর্লভযোগ ছিল। তখন রক্তবস্ত্র বা গেরুয়া পরিধান কর্লেই অবধূত বা সন্ন্যাসী হওয়া যেত না; সমাজ গ্রহণও কর্ত না।

আদর্শ গৃহস্থ না থাক্‌লে, আদর্শ ব্রহ্মচারী বা আদর্শ সন্ন্যাসীর উদ্ভব হয় না। শুদ্ধচিত্ত পূতাত্মা পিতামাতার শুক্র-শোণিতেই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। পতিব্রতা মাতার স্তনদুগ্ধেই সেই মহাপুরুষ পরিবর্দ্ধিত হতে থাকেন। পরে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'য়ে, গুরু ও গুরুপত্নীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে নিজ নিজ সাধনোচিত ভাবে রুচিভেদে,

কেহ গার্হস্থ্য আশ্রমে চলে যেতেন, কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন আবার কেহ বা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেই থেকে যেতেন। ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীগণ, ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থের নিকটেই প্রয়োজনমত ভিক্ষা গ্রহণ করতেন। সদাচারবিহীন অধার্ম্মিক গৃহস্থের নিকট কদাচিৎ এক মুষ্টিও অন্নগ্রহণ করতেন না। বনজাত ফলমূল খেয়ে ঝরণার জলখেয়ে জীবন যাপন করতেন, তথাপি অসৎ প্রতিগ্রহ করতেন না। আচারভ্রষ্ট হৃদয়হীন গৃহস্থের অন্নজল গ্রহণ করলে, তাঁদের তপস্যায় ক্ষতি হ'ত। অসৎ-প্রকৃতি লোকের হাতে জলগ্রহণ করলেও জলকণার ভিতর দিয়ে দাতার অসৎপ্রবৃত্তি গ্রহীতার মনোমধ্যে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এইজন্য ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী সর্ব্বদাই সৎগৃহস্থের অনুসন্ধান করতেন। যাঁরা তপস্যার দ্বারা অতি উচ্চস্থানে আরোহণ করতেন, কেবল তাঁরাই পাত্রাপাত্র বিচার না করে যত্র কুত্রচিৎ প্রতিগ্রহ করতেন। এক পয়সার গাঁজা কিনে খেয়ে ব্যোম ব্যোম ডাক ছাড়লে শিবঠাকুর হওয়া যায় না বা বিধিনিষেধের অতীত হওয়া যায় না। শিবঠাকুর হতে হলে আকণ্ঠ বিষপান করেও বেঁচে থাক্‌তে হবে। অমৃতের পুত্র হতে হবে। গৃহস্থাশ্রমই সকল আশ্রমের বীজপ্রদ পিতা, আনন্দদায়িনী মাতা, শুশ্রূষাকারী পুত্র ও জ্ঞানদাতা গুরু। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সকলেই গৃহস্থ। রুচিভেদে ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, আবার কশ্যপ প্রভৃতি পুত্রগণ দিতি অদিতি প্রভৃতি পত্নী গ্রহণ করে গৃহস্থ হয়েন।

দেবতা থেকে জীবজন্তু প্রভৃতি সবই সৃষ্টি কর্‌লেন। বিগত কুণ্ঠা না হলে বৈকুণ্ঠের বিষ্ণু যে কি, কেহই উপলব্ধি কর্‌তে পারেন না; সেই বিষ্ণু আমার নিত্য গৃহস্থ। বৈকুণ্ঠের সৌন্দর্য্য বা ঐশ্বর্য্য হলেন—আমার মা লক্ষ্মী—বিশ্বের পালনকর্ত্রী। বাবা বিষ্ণুঠাকুর লক্ষ্মীছাড়া হলে একদিনও বিশ্বপালন করতে পারেন না। আবার যিনি নির্ব্বিকার জ্ঞানময় দেবতা—আমার বাবা শিবঠাকুর, আমার মাকে নিয়ে পাগল, শশ্মানে বাস করেও বাবা আমার গৃহস্থ; বাবার কেমন দুটী পুত্র—একটী বিষয়রূপ বিষধরকে ভক্ষণ করে ফেল্‌তে সমর্থ এমন যে ময়ুর, তার উপর চড়ে বিশ্ব-বিজয়ী কার্ত্তিক, আর একজন কর্ম্মসূত্রকে কেটে কেটে নষ্ট করে দিতে সমর্থ এমন যে ইন্দুর, তার উপর চড়ে মুক্তহস্তে সিদ্ধিদান কর্‌ছেন গণেশ। জ্ঞানদায়িনী মায়ের চরণ দুখানি বুকে নিয়ে কখন বা মাথায় নিয়ে বাবা আমার ব্যোমকেশ দিগম্বর হ'য়ে তাণ্ডব নর্ত্তনে বিভোর। আর মা আমার মহাকালের বুকে আদর পেয়ে আনন্দময়ী হ'য়ে হাস্‌চে। গৃহস্থ! তোমরা শিবঠাকুরের পূজা কর, শিবরাত্রি কর, কেউ কেউ শিবের প্রসাদ বলে সিদ্ধি গাঁজাও খাও, কিন্তু আমার মাকে যত্ন কর না। তোমরা একদিন যদি শিবঠাকুরের অনুকরণে তোমাদের গৃহলক্ষ্মীকে একটু প্রাণখুলে আদর কর, শিবঠাকুর প্রীত হবেন, আমি জানি এত প্রীত হবেন—সহস্র বিল্বপত্রের আহুতিতেও এত প্রীত

হন না। তোমাদের আনন্দময় ও আনন্দময়ীর যুগলমূর্ত্তিতে শিবদুর্গার আবির্ভাবের মত সব আনন্দময় হ'য়ে উঠ্‌বে। তাহলেই গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। হে গৃহস্থ, আমি তোমাদের আনন্দাপ্লুত যুগলমূর্ত্তি দর্শন করে ধন্য হব; তোমাদের পবিত্র স্পর্শে আমার সাধনসোপান পবিত্র হবে—আমার সাধনা সফল হবে।

যে কোন আশ্রমে থেকে নিষ্ঠাবান্ হয়ে কাজ কর্‌লেই ও শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করে সাধন ভজন করলেই সাধক নিজ নিজ লক্ষ্যস্থানে নিশ্চয়ই পৌঁছাতে পারবেন। এমন কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি নাই, অমুক আশ্রম ছেড়ে অমুক আশ্রমে না গেলে, সাধকের কিছুতেই নিস্তার নাই। প্রত্যেক আশ্রমই স্বাধীন; প্রত্যেক আশ্রমই ফলপ্রদ ও শুভদ। তবে গার্হস্থ্য আশ্রমে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করা যায়,—সর্ব্ববিধ অধিকারীর নিরাপদ স্থান—তাই চতুর্ণামাশ্রমাণাং গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠঃ আশ্রমঃ—ঋষিকণ্ঠে উদ্গীত হয়েছে। ইহার দ্বারা কেহ বুঝিও না—অন্যান্য আশ্রমগুলী নিকৃষ্ট। ঐ যে ঋষিকণ্ঠের উক্তি—উহা গার্হস্থ্য আশ্রমের মহাপুরুষগণের উৎপত্তিস্থানের প্রশংসাবাচক উক্তি। সকল আশ্রমই সমান, অধিকারিভেদে সকল আশ্রমই শুভদ বরদ ও জ্ঞানদ। সুতরাং আদর্শ গৃহস্থ হতে পারলেই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফললাভ হ'য়ে থাকে। হে চৈ পূর্ণ শিশুগণের কোলাহলতরঙ্গায়িত গৃহে আদর্শ মহাপুরুষ যদিও সংখ্যায় অল্প, আজও পূর্ব্বের মত

সেই গৃহেই মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হচ্ছে। সমুদ্র উচ্ছসিত উত্তালতরঙ্গবিক্ষুব্ধ হলেও তার তলদেশ যেমন ধীর স্থির শান্ত গম্ভীর ও বিবিধ রত্নের আকর, তেমনি আদর্শ গৃহস্থের বাহিরে উচ্ছাসতাণ্ডবতা থাক্‌লেও, বেদমুখরিত হোমানল মন্দীপিত বেদীর পার্শ্বে সুতিকাগৃহ থাক্‌লেও, তার অন্তরদেশ সূক্ষ্ম যোগময়, জ্ঞানময়, শান্ত ও ধীর এবং মহাপুরুষগণের আবির্ভাব স্থান। যাঁরা ভ্রান্ত ধারণা বসে বলে থাকেন, সংসার না ছাড়লে, ধর্ম্ম কর্ম্ম হবে না, সাধনভজন হবে না,—সংসার বড় ঝঞ্ঝাটপূর্ণ স্থান, আমার মনে হয়,—গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ কি, গৃহস্থ কাকে বলে তাঁরা মোটেই অনুভব করেন নি, শিক্ষাও করেন নি।

গার্হস্থ্য আশ্রমে গৃহস্থের পক্ষে যেমন অনেকগুলি বিধিনিষেধ আছে, তুরীয় আশ্রম বা সন্ন্যাস আশ্রমে সন্ন্যাসীর পক্ষে অবশ্যপালনীয় কতকগুলি বিধিনিষেধ আছে, সেগুলি আরও কঠোর। কোন অবধূত স্বামী বা সন্ন্যাসী গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করে যদি আসক্তিপূর্ণ বৈষয়িক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন, সন্ন্যাসগ্রহণে অবশ্যকরণীয় বিরজাহোমে পূর্ণাহুতি দিয়েও যদি রজোগুণের অনুশীলন করেন, তা'হলে সাধারণ গৃহস্থের সঙ্গে তত্ত্বের দিক্ দিয়ে বিচার কর্‌লে তাঁরা সমপর্য্যায়-ভুক্ত হয়ে পড়েন

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়ে সনাতন ধর্ম্মের সুবহুল উন্নতিসাধন করে গেছেন। তন্ত্রের

মিথ্যা ব্যাখ্যায় ধর্ম্মান্ধ নরনারীগণকে প্রভাবিত করে যে সমস্ত কাপালিককূল একদিন ভারতের বুকের উপর অবাধ ব্যভিচার চালিয়েছিলেন, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁর কঠোর সাধনাবলে, সেই কাপালিককূল নির্ম্মূল করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ মনীষাবলে দ্বৈতবাদ খণ্ডন করে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, সন্ন্যাস আশ্রমের অভূতপূর্ব্ব উন্নতিসাধন করেছেন, সংস্কার করেছেন, গঠন করেছেন; আর আসমুদ্রহিমাচল ভারতের বুকে এক সুদৃঢ় সুগঠিত দশনামাধ্যায়ী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর আর একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি—সর্ব্বজনবিদিত কুম্ভমেলা। সেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, সন্ন্যাসধর্ম্মের চারিটী অবস্থা কীর্ত্তন ও প্রবর্ত্তন করে গেছেন। এই চারি অবস্থার ভিতর দিয়েই সন্ন্যাসিগণ ক্রমবিকাশের পথে আত্মদর্শন প্রভৃতি লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হন। প্রথম অবস্থার নাম "বহুদক্ষ" অবস্থা। এই অবস্থায় সন্ন্যাসিগণ বহুজনপদ পরিভ্রমণ করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়বোধ ফোটাইয়া তোলেন। এই বহুদক্ষ অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়ে সন্ন্যাসিগণ দ্বিতীয় অবস্থায় আসেন—উহার নাম "কুটীচক" অবস্থা। ঐ অবস্থায় আসিয়া কঠোর তপস্যা করিতে হয়। তপস্যায় সাফল্যলাভ করিয়া সন্ন্যাসীগণ তৃতীয় অবস্থায় উপস্থিত হন—উহার নাম "হংস" অবস্থা। হাঁস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জলটুকু ত্যাগ করিয়া দুধটুকু গ্রহণ করেন, কঠোরতপা সন্ন্যাসী ঐ অবস্থায় আসিয়া সর্ব্ব-

বিষয়ে দোষত্যাগপূর্ব্বক গুণগ্রহণে অভ্যাসপটু হন। ইহাই মোহান্ত অবস্থা, যিনি মোহের অন্তে অর্থাৎ শেষ সীমারেখায় উন্নীত হয়েছেন, তিনিই মোহান্ত। এইরূপ মোহান্ত মহা পুরুষগণকে পুনরায় বিষয়বৈভবের মধ্যে টানিয়া আনিয়া মঠাধ্যক্ষের ভার দেওয়া হত। আসক্তিপরিশূন্য হইয়া মাত্র দেবসেবা ও লোকহিতার্থে বিষয় পরিচালনা করিতে সমর্থ হয়েন কিনা তাহার পরীক্ষা হত। হংসের মত অসার ত্যাগ করিয়া সারগ্রহণ কর্‌তে সম্পূর্ণ পটু হলেই সন্ন্যাসিগণ ঐ অবস্থা হইতে চতুর্থ অবস্থায় চলিয়া যাইতেন। চতুর্থ অবস্থার কথা পরে বলিতেছি,—এবং তৃতীয় অবস্থায় সন্ন্যাসী-গণ লোকশিক্ষার্থে অনেক কিছু করিয়া থাকেন সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা এখানে বলিয়া রাখি। পরমহংসদেব গৃহস্থ-গণকে পাঁকাল মাছ হয়ে সংসার কর্‌তে উপদেশ দিয়ে গেছেন, সন্ন্যাসিগণের তৃতীয় অবস্থাও ঠিক পাঁকাল মাছের অবস্থা। পাঁকাল মাছ, পাঁকে থাকে, কিন্তু তার গায়ে কাদা লাগে না। সন্ন্যাসীগণ লক্ষ লক্ষ টাকার বিষয় রক্ষার জন্য মামলা মোকদ্দমা কর্‌বেন, দুর্দ্দান্ত প্রজাকে শাসন কর্‌বার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা কর্‌বেন, কিন্তু আসক্তি-পরিশূন্য হয়েই সব কর্‌বেন, মোহাক্রান্ত হয়ে কিছুই কর্‌বেন না, মোহান্ত হয়েই সব কিছু কর্‌বেন। জমিদারীরক্ষার জন্য কতকগুলি অশিক্ষিত ব্যক্তিকে সন্ন্যাসিদলের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তারা সাধনভজন মামুলীমত করিত; কিন্তু

জমিদারী পরিচালনের জন্য কোথাও দাঙ্গাহাঙ্গামা মারামারি কর্‌বার প্রয়োজন হলে, ঐ অশিক্ষিত সন্ন্যাসিসম্প্রদায় মোহান্তের আদেশে লাঠিসোটা মুদ্‌গর হাতে করে, পদাতিক সৈন্যশ্রেণীর মত ছুট্‌ত; উহাদিগকে নাগাসম্প্রদায় বলা হ'ত। উহারা প্রায় উলঙ্গ থাকিত।

এই আসক্তিপরিশূন্য হংসশ্রেণী সন্ন্যাসীগণই লোক শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের সম্মুখে শির'পরিধৃতস্বর্ণচ্ছত্র ও সুসজ্জিত হয়ে হস্তীর উপর আরোহণ করে কুম্ভমেলায় শোভাযাত্রায় এখনও বাহির হয়ে থাকেন। কি মহান্ আদর্শ, রজোগুণের চরম উৎকর্ষের মধ্যে মুণ্ডিত কেশ উলঙ্গ সন্ন্যাসী অনাসক্তভাবে বসে আছেন। ভোগসর্ব্বস্ব জীব বিস্ময়চঞ্চলনেত্রে ঐ দৃশ্য দেখ্‌ছেন,—আর আনতমস্তকে নমো নারায়ণায় বলে প্রণাম কর্‌ছেন। ধন্য শঙ্করাচার্য্য! ধন্য তোমার অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

এই আসক্তিপরিশূন্য হংসজাতীয় সন্ন্যাসীগণই মঠের অধ্যক্ষ হতেন, পদ্মপত্রকে দীর্ঘকাল জলে ডুবিয়ে রাখ্‌লেও যেমন তার গায়ে জলের দাগ পড়ে না, তেমনি ঐ সব মহাপুরুষ মঠাধ্যক্ষ মোহান্তগণ, নিয়ত বিষয় সংসর্গ কর্‌তেন, কিন্তু মনে বিষয়ের দাগ লাগ্‌ত না। তাঁদের বসন ভূষণের পরিপাট্য ছিল না, যানবাহনের শ্রেণীবিভাগ ছিল না। তারা বর্ত্তমানের "মহন্ত" মহারাজ ছিলেন না, তারা মোহান্ত ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে আদর্শভ্রষ্ট মঠাধ্যক্ষগণের আচার ব্যবহার আলোচনা করলে, বড়ই দুঃখ হয়। প্রায় অধিকাংশ মঠাধ্যক্ষগণ আজ

ভোগের পথে ছুটেছেন। বিলাসী ধনীর মত অনেক মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসীগণ, আজকাল ঈষৎ গেরুয়া রঙ্‌কে মাত্র ব্যবধান রেখে বসনে ভূষণে গন্ধে প্রসাধনে যানে বাহনে রতিসুখসারে ফুল্ল-কুসুমহারে প্রতিদ্বন্দিতায় অগ্রসর হয়েছেন। যাঁরা আবার আশ্রমধারী ; তাঁদের মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে সভাপতি নির্ব্বাচন নিয়ে প্রভুত্ব নিয়ে অধিকার নিয়ে মারামারি খুনোখুনি চলেছে। এই সব সন্ন্যাসীকে হংসজাতীয় সন্ন্যাসী বলা চলে না, এঁরা পতিত লক্ষ্যভ্রষ্ট, কিন্তু তথাপি এঁরা স্বর্ণকুম্ভ ; ঐ মোহটুকু কেটে গেলেই আবার অতি সত্বর জ্ঞানোজ্জ্বল মোহান্ত হতে পারবেন।

যাঁরা এই "হংস" অবস্থার পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করেন' অর্থাৎ প্রকৃত পাঁকাল মাছ হতে পারেন, তাঁরা চতুর্থ অবস্থায় চলে যান। চতুর্থ অবস্থা "পরমহংস" অবস্থা, অর্থাৎ সর্ব্বভাব-বিনির্মুক্তি অবস্থা। তাঁরা বিধিনিষেধের অতীত হন ; তাঁরা সমাধিস্থ ব্যক্তি, এবং জীবত্বের চরম ও আদর্শ পরিণতি।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের চারি জন প্রধান শিষ্য,—১। ত্রোটকাচার্য্য। ২। পৃথ্বীধরাচার্য্য। ৩। বিশ্বরূপাচার্য্য। ৪। পদ্ম-পাদাচার্য্য ; ইহাঁরা শ্রীগুরূপদেশে দশটি নামের আখ্যা দিয়া সন্ন্যাসী শিষ্যমণ্ডলী সৃষ্টি করেন। ত্রোটকাচার্য্যের শিষ্য-সম্প্রদায়,—গিরি, পর্ব্বত ও সাগর এই তিনটী নাম গ্রহণ করেন। বিশ্বরূপাচার্য্যের শিষ্য সম্প্রদায়,—আশ্রম ও সরস্বতী এই দুইটি নাম গ্রহণ করেন। পদ্মপাদাচার্য্যের শিষ্যসম্প্রদায়,—

পুরী ও ভারতী এই দুইটি নাম গ্রহণ করেন। এই দশ নামাধ্যায়ী সন্ন্যাসীগণ,—কেহ "বহুদক্ষ" অবস্থায়, কেহ "কূটীচক" অবস্থায়, কেহ "হংস" অবস্থায়, কেহ বা "পরমহংস" অবস্থায় অবস্থান করেন। "বহুদক্ষ" অবস্থার সন্ন্যাসীগণ কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়বোধ সৃষ্টি কর্‌বার জন্যই মায়িক জগতের সংসর্গে আসেন। প্রত্যেক জীবের মধ্যেও প্রত্যেক বস্তুতে ব্রহ্ম বিদ্যমান রয়েছেন; প্রত্যেক কর্ম্মই ব্রহ্মের সেবা—এই বোধ ফুটিয়ে তুল্‌তে, এই বোধ সাধনা কর্‌তে "বহুদক্ষ" অবস্থার সন্ন্যাসীগণ শ্রীগুরুর আদেশে জনসমাজে আসিয়া থাকেন। জনসমাজ, অর্থাৎ গৃহস্থগণ; তাঁদের "নৃযজ্ঞের" পরম উপাদেয় অতিথিকে প্রাপ্ত হয়ে সেবা করে ধন্য হন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বহির্বিকাশস্বরূপ মহাযোগী স্বামী বিবেকানন্দ, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় বোধ ফুটিয়ে তুল্‌তে অগণিত সন্ন্যাসীকে "বহুদক্ষ" অবস্থায় টেনে এনে নারায়ণের সেবায় প্রবৃত্ত করেছেন। তাঁর প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ আজ কোথায় বন্যাপীড়িত, কোথায় দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত কোথায় ব্যাধিগ্রস্থ আবার কোথায় আক্ষরিক-জ্ঞানবর্জ্জিত শিশুগণের সেবায় নারায়ণের সেবা মনে করিয়া গৈরিক পতাকা উড়িয়ে ছুটেছেন, বিশ্বের কত মঙ্গল সাধন কর্‌ছেন! তাঁদের নিকট প্রত্যেক ছোট বড় জীবটি নারায়ণ, প্রত্যেক কর্ম্মটী নারায়ণেরই সেবা জ্ঞান ও কর্ম্মের কি সমন্বয়বোধ। শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত "বহুদক্ষ" অবস্থার কি অপূর্ব্ব বিকাশ!

এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে বর্ত্তমানে ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘপ্রভৃতি বহু জনহিতকর সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়েছে। হে গৃহস্থ! এই সব নারায়ণসেবী আত্মভোলা নিবেদিত প্রাণ মহাপুরুষগণকে সশ্রদ্ধায় সেবা করিও। ঐ সন্ন্যাসীগণের মধ্যে পুর্ব্বাশ্রমে যদি কেহ অতি নীচজাতি থেকেও থাকেন, তুমি "নমো নারায়ণায়" বলে মস্তক নত করিও। তিনি বিধি-পূর্ব্বক সন্নাস গ্রহণ করেছেন কিনা; সন্ন্যাস গ্রহণ করায় তাঁর অধিকার আছে কিনা,—এসব বিচার বর্ত্তমানে আর করিও না; কেবল লক্ষ্য রাখ,—পরহিতকল্যাণ ঐ সন্ন্যাসী নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন কিনা; সমাজ কল্যাণে নিজের সবটুকু উৎসর্গ করেছেন কিনা। ওগো, তুমি ঐ সব সন্ন্যাসীগণকে সেবা করিও, সমাজকল্যাণকারীকে সেবা কর্‌লে, সে সেবা সমাজের জনগণকেই করা হয়, সে সেবা নারায়ণকেই করা হয়, কেবল করা হয় না, নারায়ণ তোমার সেই সশ্রদ্ধসেবা, বহু হাত বাড়িয়ে বহুমুখে গ্রহণ করেন।

আদর্শ গৃহস্থ মুনি ও ঋষিগণ কর্ম্মবহুল গার্হস্থ্যজীবনকে এমনভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করে গেছেন, এমন সহজ উপায় দেখিয়ে গেছেন, যে কোন ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মুর্খ—যে কোন অবস্থার গৃহস্থ হউন না কেন, যতই কর্ম্মব্যস্ত হউন না কেন, অতি সহজে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন কর্‌তে সমর্থ হবেন। কিছু করবো না, আত্মার উন্নতি সাধনে মন দিব না, শাস্ত্রবাক্য শুন্‌বো না, পশু জীবন যাপন কর্‌বো, ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে

চল্‌ব—এইরূপ অভিপ্রায় যাঁদের, তাদের সম্বন্ধে আমার কিছু বল্‌বার নাই। কিন্তু যাঁরা ধর্ম্মপিপাসু, আত্মার উন্নতিকামী, অথচ কর্ম্মজীবনে ধর্ম্মানুশীলনে অবসর পান না, সুযোগ পান না, তাঁদের জন্যই এই সহজ সাধন সোপান।

গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রধান সহায়, সদ্‌বংশজাত গৃহিণী। বিবাহের সময় অর্থ ও সৌন্দর্য্য দেখেই প্রায় শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হ'য়ে থাকে। গৃহস্থের এইখানেই প্রথম ভুল হয়,—তাই সংসারে এত অশান্তি। যেখান থেকে কন্যা গ্রহণ করা হবে, সেই কন্যার পিতামাতা বংশমর্য্যাদা কেমন, তাঁদের আচার ব্যবহার, সৌজন্য, জনপ্রিয়তা শিক্ষা দীক্ষা কেমন, সেইগুলি ঠিক পাত্রের বংশের সঙ্গে খাপ খাবে কিনা—ইহাই প্রথম দ্রষ্টব্য। তারপর পাত্রের ও কন্যার মনোবৃত্তি কেমন, নৈসর্গিক রাশিচক্রের মিলনের দ্বারা তাহা ঠিক করে নিতে হবে। শুভবিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পরই পাত্রের প্রধান কর্ত্তব্য হবে—নিজের স্ত্রীকে আদর্শমুখী করে তোলা, মনের মত করে গঠন করা। অধিক বয়স্কা কন্যার সুকোমল মনোবৃত্তিগুলি যদি তার পিতৃগৃহেই শুভ কর্ম্মের পূর্ব্বেই সুগঠিত হয়ে যায় অর্থাৎ পেকে যায়, তখন সেই কন্যাকে তার স্বামী পতিদেবতা আর মনের মত গড়ে নিতে পারে না। এবিষয়ে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। উদারনৈতিক মহর্ষি মনু তাঁর সংহিতাশাস্ত্রে সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়েছেন ;—ষোল বৎসরের মধ্যেই কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। যদি কন্যাপক্ষগণ

ষোল বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহ না দেন, উদাসীন থাকেন কন্যা স্বয়ং পতি নির্ব্বাচন করে নেবেন,—আর কালক্ষেপ করবেন না। এই সমস্ত বিবেচনার ভুল হলেই অনেক ক্ষেত্রে যথারণ্যং তথা গৃহম্ হ'য়ে দাঁড়ায়। অরণ্যম্ অর্থাৎ বনম্।

সদ্বংশজাতা কন্যা প্রায়ই সুশীলা হন। গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রধান সুলক্ষণ হচ্ছে,—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সর্ব্বদাই আপোষ করে চলা, মনের মিল হওয়া। অসদ্বংশের কন্যা ঘরে আনলেই প্রায়ই অশান্তি হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৫৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—অতি সদ্বংশজাতা যা সুশীলা কুলপালিকা। অসদ্বংশপ্রসূতা যা দুঃশীলা ধর্ম্মবর্জ্জিতা। মুখদুষ্টা যোনিদুষ্টা পতিং নিন্দতি কোপতঃ। অতি সদ্বংশে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করেন তিনি সুশীলা ও কুলপালিকা হন। আর যিনি অসদ্বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি দুষ্টস্বভাবা ও ধর্ম্মবর্জ্জিতা হন; তাঁর মুখে মিষ্ট ও সভ্য ভাষা শুনতে পাওয়া যায় না, তাঁর চরিত্রও ভাল হয় না, তিনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে পতিদেবতার নিন্দা করে থাকেন। সুতরাং অতি দরিদ্র হলেও সদ্বংশজাতা কন্যা সর্ব্বদা গ্রহণীয়া, অর্থলোভে বা বাহ্য চাক্‌চিক্যের মোহে অথবা ব্যবসায়বুদ্ধিতে ইহার অন্যথা করলেই ইহলোকে ঘোর অশান্তি ও দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা আর পরলোকে সুনিশ্চিত নরক-ভোগ। স্বামী স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে সম্মান ও মর্য্যাদা দিয়ে চলবেন; কুলবধূকে দাসী বলে যে কুসংস্কার চলছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করতে হবে, সাংসারিক ব্যাপারে স্বাধীনতা

দিবেন, বাক্যবাণে বিদ্ধ করে মনোব্যথা দিবেন না, পতি পরমগুরু হয়ে গুরুত্ব বজায় রেখে, সদুপদেশ দিবেন, স্বামী হ'য়ে সহনশীল হবেন, কদাচ ধৈর্য্যচ্যুত হবেন না, আর স্ত্রীও স্বামীকে কুরূপ হ'ক, সুরূপ হ'ক, বিদ্বান্ হ'ক, মুর্খ হ'ক, ধনী হ'ক, দরিদ্র হ'ক, ক্রোধী হ'ক শান্তস্বভাব হ'ক দেবতাজ্ঞানে আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মান করে চল্‌বেন এবং আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হবেন অন্যথা উভয়েরই কর্ত্তব্যচ্যুতিতে, উভয়েরই প্রাধান্যপ্রতিযোগীতায়, উভয়েরই দম্ভের সীমাহীন উচ্ছ্বাসে উভয়ের মনোবৃত্তি মলিন হয়ে যায়; তার ফলে কতকগুলি দুষ্টপ্রকৃতি সন্তান এসে বংশের নাম ডুবিয়ে দেয়, চারিদিকে কুৎসা রটে, অদূর ভবিষ্যতে দারিদ্র এসে দেখা দেয়,—পরলোকেও ঐরূপ স্বামী-স্ত্রীকে অশেষ নরকযাতনা ভোগ কর্‌তে হয়, আবার পরজন্মে ঐরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত কুৎসিৎ সংস্কার নিয়ে জন্মাতে হয়,—এই ভাবে কত জন্মই অশান্তিতে কাটে। কুসন্তান হয়েছে বলে, সন্তানকে দোষারোপ কর্‌লে কি ফল হবে; উহারা যে তোমাদেরই মনোবৃত্তির পরিবর্দ্ধিত নয়নাভিরাম উজ্জ্বল সংস্করণ। ওগো, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। একবার মনোবৃত্তি মলিন বা কুৎসিত হ'লে, তাকে সহজে নির্ম্মল বা সুমার্জ্জিত করে তোলা বড়ই কঠিন। "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি" কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার শতবার ধুয়ে ফেল্‌লেও—সে তার মলিনত্ব ত্যাগ করে না। একমাত্র উপায় তাতে অগ্নি সংযোগ করা। এক-

মাত্র জ্ঞানাগ্নিই মলিন মনোবৃত্তিকে নির্ম্মল করতে পারে। দ্বিতীয় উপায় নাই ; ঘর্ষণ ভিন্ন যেমন অগ্নির উৎপত্তি হয় না, তার মূলে যেমন একটা প্রচেষ্টা আছে, ঠিক তেমনি জ্ঞানাগ্নির উৎপত্তি করতে হলে, বেদোক্ত তন্ত্রোক্ত সৎকর্ম্মের ঘর্ষণ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করতে হবে। বিনা কর্ম্মে জ্ঞানের উৎপত্তি কোথায়। ঐ শোন—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান কি উপদেশ দিচ্ছেন ;

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাহপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥

জনকাদিমহাত্মগণ, কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানলাভ করেছিলেন, তাঁহারা কর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই ; তুমি তাঁদের পথ অনুসরণ কর। তোমারও লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সুতরাং যে কোন উপায়ে দাম্পত্য-প্রেমকে সজীব করে নিয়ে স্বামী স্ত্রী উভয়ে উভয়ের কর্ত্তব্য অনুসরণ করে চলবেন। সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌তে হবে,—দাম্পত্য-প্রেম সজীব না হলে কোন সাধকই গার্হস্থ্য আশ্রমে থেকে সাধন-সোপানের প্রথম পাদপীঠেও দাঁড়াবার অধিকারী হবেন না। স্বামী স্ত্রী, হয়ত' প্রত্যহ হাজার হাজার ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন, এদিকে উভয়ের মধ্যে মোটেই মনের মিল নাই, হয়ত' বা জপসমাধা করে, তুর্ব্বল মস্তিকে উভয়ে উপেক্ষণীয় কারণে বাক্‌যুদ্ধে, হয়ত' বা মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে পড়েন। এখন আমার জিজ্ঞাস্য—ওগো প্রাধান্যপ্রতিযোগিদম্পতী! উভয়ে

একস্থানে দিবা-রাত্র থেকে এক ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত হয়ে, সাংসারিক সুখদুঃখের তুল্য অংশীদার হয়ে সন্তানসন্ততির জনক-জননী হ'য়ে, এক আবহাওয়ার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হতে হতে যদি তোমাদের মিলন না হয়, উভয়ের যদি আত্মীয়তাবোধ না জন্মে, তবে জপের দ্বারা দূরস্থ অজানা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন বা আত্মীয়তা কেমন করে সম্ভব হবে? তোমরা যখন এত নিকটে থেকে উভয়কে উভয়ের দরদী করে তোল্‌বার শক্তি রাখ না, তখন কোন শক্তিবলে দূরস্থ ঈশ্বরকে অন্তরের অন্তরে বসিয়ে কেমন করে তাঁকে দরদী করে তুল্‌বে?

সুতরাং শুভ-বিবাহের পর দাম্পত্যপ্রেমকে সজীব করে তুল্‌তে হবে। তারপরই কালবিলম্ব না করেই "সস্ত্রীকো ধর্ম্ম মাচরেৎ", উভয়কে দীক্ষাগ্রহণ করতে হবে। যদি কোন কারণে এক সঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ অসম্ভবই হয়, যাঁর যেমন সুবিধা, তিনি সেইভাবেই দীক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। স্বামীর দীক্ষা না হ'লে স্ত্রীর দীক্ষা হ'তে নাই, ইহা শাস্ত্রের যুক্তি নহে। বড় ভাইএর দীক্ষা না হ'লে ছোট ভাইএর দীক্ষা হ'তে নাই, ইহাও একটী কুসংস্কার। দীক্ষা গ্রহণে পূর্ণ স্বাধীনতা। স্বামীর স্ত্রীর যে একই গুরু হ'তেই হবে, এমন কোন যুক্তি নাই। কালমাত্র বিলম্ব না করে, যার যখনই সুযোগ ও সুবিধা হবে, তাহার সদ্ব্যবহার কর্‌বে।

কর্ম্মবহুল জীবনে সংক্ষেপে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করা অসম্ভব নয়। ওগো, দীক্ষার পূর্ব্বে জমার ঘরে কাণাকড়িও পুঁজি

হচ্ছিল না, তবুও যা' হয় কিছু হবে। অধ্যবসায় থাক্‌লে,—তিল কুড়িয়ে তাল হয়। অতি সূক্ষ্ম জলকণা একস্থানে সংগৃহীত হ'য়েই সপ্তসমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে, অতি ক্ষুদ্র একটী বালুকণার অভ্যাসযোগেই বিস্তৃত মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। ওগো, তোমার গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র, সংখ্যায় যত কমই জপ কর, একদিন অভ্যাসযোগে উহা বিপুল আকার ধারণ করে তোমার ইষ্টকে সম্মুখে এনে দাঁড় করাবে।

পঞ্চযজ্ঞ।

গৃহস্থের অবশ্যকরণীয় কর্ম্মগুলিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। উহাকেই পঞ্চযজ্ঞ বলা হয়। প্রত্যেক গৃহস্থই কিছু না কিছু ঐ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে থাকেন। কেমন ভাবে ঐ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান হ'লে, উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, উহা সাফল্যমণ্ডিত হয়, আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়, অনেকেই তাহা জানেন না। ব্রহ্মযজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চ দৈবযজ্ঞশ্চ উত্তমঃ। পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞঃ পঞ্চযজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ, ইহাই পঞ্চযজ্ঞ নামে কথিত ; প্রত্যেক গৃহস্থের ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য। ঠিক ঠিক এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান হ'লে গৃহস্থের সর্ব্বপাপক্ষয় হবে, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ

এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভও হবে। এই পঞ্চযজ্ঞই গৃহস্থগণের সাধন-সোপান।

১। ব্রহ্মযজ্ঞ,—ব্রহ্মা অর্থে সৃষ্টিকর্ত্তা, বিধি, প্রজাপতিকে বুঝায়; তাঁকে যজন করা। যজন করা অর্থে,—পূজা, তর্পণ, সম্মান, ভালবাসা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক অনুশীলন সবই বুঝায়। আমাকে পূজা কর্‌বে, অথচ আমার উপদেশ শুন্‌বে না—এরূপ পূজায় কোন সার্থকথা নাই। সুতরাং ব্রহ্মাকে যজন করা অর্থে,—তাঁর উপদেশ শুনে চলা—তাঁর মুখনিঃসৃতবাণী অনুসরণ করা। আরও পরিস্কার করিয়া বলিলে এই বলা যায়,—বেদ, উপনিষদ্, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও তন্ত্র-মতানুসারে চলা। বিভিন্ন অধিকারীর জন্য শাস্ত্রে বিভিন্ন মত আছে, বিভিন্ন পথ আছে, একের পক্ষে সকল মত সকল পথ অনুসরণ করা সম্ভব নয়। কাজেই গৃহস্থের পক্ষে গুরুকরণ করা হলেই—গুরুবাক্য অনুসরণ করে চলিলেই ব্রহ্মযজ্ঞ সমাধা করা হয়। শাস্ত্রে যত মতই থাকুক, যত পথই থাকুক,—শ্রীগুরুদেবের মতই তোমার মত, শ্রীগুরুদেবের প্রদর্শিত পথই—তোমার পথ ইহাই ব্রহ্মযজ্ঞের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

২। নৃযজ্ঞ,—নৃ শব্দের অর্থ মনুষ্য, নর, কোন সম্প্রদায় বিশেষের নর নহে, বিশ্ব মানবকেই বুঝায়, তাকে যজন করা। যজন শব্দের অর্থ পূর্ব্বে দেখান হয়েছে। মানুষকে ভালবাসা অবজ্ঞা না করা, অতিথির পরিচর্য্যা করা, সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করা, ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া, স্ত্রী পুত্র কন্যা পিতামাতা

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে যথাশক্তি পালন করা, সাহায্য করা, সম্মান করা, তৃপ্ত করা ইহাই নৃযজ্ঞ। কেহ পান্থশালা নির্ম্মাণ করে দিয়ে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিচ্ছেন, কেহ জলসত্রের ব্যবস্থা করে শুষ্ককণ্ঠ পথিকের কণ্ঠ সিক্ত করছেন, কেহ বা অন্নসত্র স্থাপন করে ক্ষুধিত জনগণের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছেন। এইগুলি সবই নৃযজ্ঞ। কেহ আবার অজ্ঞানীকে জ্ঞান দিচ্ছেন। বিদ্যালয় স্থাপন করে অশিক্ষিত নরনারীকে শিক্ষিত করে তুল্‌ছেন, কেহ চিকিৎসালয় স্থাপন করে পীড়িতজনগণকে নিরাময় করে তুল্‌ছেন, কেহ বা রামায়ণ মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থের পঠন ও পাঠনের দ্বারা সাধারণের আত্মোন্নতি সাধন কর্‌ছেন,—এ সমস্তগুলিও নৃযজ্ঞ। নৃযজ্ঞ শব্দের ইহাই ব্যাপক অর্থ—যে কোন প্রকারে মানুষের বৈধসেবা। মানুষকে অকারণ অসম্মান করা, দুর্ব্বলকে দু'কথা শুনিয়ে দেওয়া, অযথা লোকের প্রাণে ব্যথা দেওয়া,—এগুলি নৃযজ্ঞের বিরোধী। সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌বে,—একজন অকারণ পীড়িত ভিখারীর উষ্ণ-নিশ্বাসে তোমার যে ক্ষতি হতে পারে, পৃথিবীর সম্রাট্ সর্ব্বশক্তি দিয়ে সে ক্ষতিপূরণ কর্‌তে পারেন না।

গুরুদত্ত মন্ত্রটি যদি শাব্দ বোধের সহিত ব্যখ্যা করিয়া লও, সাধনপ্রক্রিয়া দ্বারা চৈতন্যময় করিয়া লও, দেখ্‌তে পাবে, তুমি যাঁকে মন্ত্রের দ্বারা ডাক্‌ছ, ভাবনা কর্‌ছ, ধ্যান কর্‌ছ,—যাঁর বিগ্রহমূর্ত্তির সেবা করে ধন্য হচ্ছ, ভক্তি করে তৃপ্ত হচ্ছ, তিনিই বিশ্বজীবে বিরাজ করছেন, বিশ্বের প্রতি

স্তরে স্তরে অণু পরমাণুতে চিচ্ছক্তিতে পরিব্যপ্ত রয়েছেন। ওগো, পরমহংস বল্‌তেন, "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্মা পড়ে কাঁদে।" তুমি যখন মনুষ্যগণের সেবা কর, তখন যদি গুরুদত্ত মন্ত্রের ঐ চৈতন্যময় ভাব লইয়া সেবা কর, তাহ'লে কিছুদিনের অভ্যাসেই তোমার নৃযজ্ঞের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। সন্ন্যাসীগণের "বহূদক" অবস্থা আর গৃহস্থগণের "নৃযজ্ঞ" একই অবস্থা। সন্ন্যাসীগণের জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় বোধ ফুটিয়ে তোলা, আর গৃহস্থগণের নৃযজ্ঞের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা আধ্যাত্মিক জগতে ইহা একই স্তরের কথা।

৩। দৈবযজ্ঞ,—অর্থে দেবতাসম্বন্ধীয় যজনক্রিয়া। দেবতাকে স্মরণ, মনন, কীর্ত্তন, দর্শন, জপধ্যান, পূজাহোম, সেবাপ্রণতি, স্তবস্তুতি করাকে দৈবযজ্ঞ বলা হয়। দেবযজ্ঞ বলিলে ব্যাপক অর্থ পাওয়া যেত না,—সেজন্য "দৈব" শব্দের যোজনা করা হয়েছে,—ইহাতে দেবতাপ্রতিষ্ঠা, মন্দির গঠন, মন্দির পরিচালন, দেবকীর্ত্তিস্থাপন, দেবসেবায় অর্থদান ও বিষয়সম্পত্তিদান, এমন কি সর্ব্বজনীন পূজায় যথাশক্তি অর্থদান সবই দৈবযজ্ঞের অন্তর্ভূক্ত। এখন প্রশ্ন আস্‌তে পারে,—কাহাকে দেবতা বলা যাবে? হিন্দুধর্ম্মে তেত্রিশ কোটী দেবদেবী আছেন, উপাসকও সম্প্রদায়ভেদে অসংখ্য। আমি কোন দেবতার যজ্ঞ করিব? খৃষ্ট ও মুসলমানের দেবতাকে দেবতা বলিয়া মানিব কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়,—তোমার যিনি ইষ্টদেবতা এবং ঐ দেবতাকে

যিনি দেখিয়ে দিয়েছেন—সেই শ্রীগুরুদেব, ইহাঁরাই তোমার দেবতা। যদিও ইষ্টদেব ও শ্রীগুরু অভিন্ন, তথাপি একস্থানে থাকিলে, সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুদেবের পূজাবন্দনা করিবে। শ্রীগুরুদেব উপস্থিত থাকিলে, সেখানে আর যতই গুরুস্থানীয় ব্যক্তি থাকুন না, সর্ব্বপ্রথম শ্রীগুরুর চরণবন্দনা করিতে হয়। তোমার যিনি ইষ্টদেবতা ও আরাধ্য দেবতা তিনিই ব্রহ্ম। তোমার ইষ্টদেবতা ও ব্রহ্ম—অভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মই তোমার ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি ধারণ করেছেন তোমাকে এই বিশ্বাসে উপনীত হতে হবে। ব্রহ্মের অনন্ত-মূর্ত্তি ও অনন্ত প্রকাশ; সুতরাং তোমাকেও বিশ্বাস কর্‌তে হবে যে তোমার যিনি ইষ্টদেবতা তাঁর অনন্ত শক্তি, অনন্ত মূর্ত্তি ও অনন্ত প্রকাশ। সুতরাং যেখানে যত দেবতাই থাকুন, সবই'ত তোমারই ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি ও সবই তোমার ঐ ইষ্টদেবতার প্রকাশ। তোমার ইষ্টদেবতা ক্ষুদ্র বিগ্রহের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে শেষ হয়ে যায় নাই, তোমার ইষ্টদেবতা ঐ একখণ্ড শিলার মধ্যে সমাহিত হ'য়ে ফুরিয়ে যায় নাই। তুমি যখন নারায়ণকে তুলসী দাও "নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" এই মন্ত্রবলে যুগযুগান্তর ধরে তুলসী দিয়ে আস্‌ছ। তোমার নারায়ণের যে বহুরূপ তিনি যে বিষ্ণু, ব্যাপ্তিরূপে বিশ্বব্যাপিয়া আছেন, তিনি যে খণ্ড ও অখণ্ড আত্মরূপে বিরাজ কর্‌ছেন, একথা তুমি প্রত্যহ তামা তুলসী গঙ্গাজল হাতে করে শালগ্রামশিলার সম্মুখে

বসে স্বীকার করছ। অথচ তুমি শাক্তমন্দিরে শৈবমন্দিরে যেতে ভয় পাও, কেবল ভয় পাও না, তোমার কুসংস্কার আছে, সেখানে তোমার বিষ্ণুনারায়ণ নাই। তোমার কুসংস্কার আছে, অন্য কোন মূর্ত্তিকে বিষ্ণুমূর্ত্তি বলে ভাবনা করলে তোমার একনিষ্ঠভাব নষ্ট হবে। বলি, বৎস, একনিষ্ঠ ভাব'ত জীবনভর অভ্যাস করলে, হয়ত জন্মজন্মান্তর ধরে অভ্যাস করে আসছ,—"নমস্তে বহুরূপায়" বলে তুলসীও দিয়ে আসছ, এইবার মন্ত্রটীর একটু শাব্দ বোধ করে নাও, মিথ্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ কর, মন্ত্রটি চৈতন্যময় করে তোল, চিরদিনই কি প্রথমভাগ পড়বে, ঐ জীর্ণ পুস্তক রেখে বোধোদয় পুস্তক গ্রহণ কর—অবশ্য ধীরে ধীরে গ্রহণ কর, স্মরণ রেখো—বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি প্রেমাবতার তিনি অবশ্যই ভুল করেন নি—তিনি দুটী বাহু তুলে বলেছিলেন,—"যাঁহা যাঁহা আঁখি জুড়ে সব কৃষ্ণময় দেখি"।

সুতরাং যদি তুমি শাক্ত হও, মনে করে নাও,—তোমারই মা জগতের সমস্ত মূর্ত্তি ধারণ করেছেন, যদি তুমি শৈব হও, মনে মনে অভ্যাস কর—তোমার বাবা শিবঠাকুর বিশ্বরূপ ধারণ করেছেন, যদি তুমি বৈষ্ণব হও, তুমিও ধীরে ধীরে অভ্যাস কর—"নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে"। সুতরাং বিশ্বের যত কিছু দেবরূপ, সবই তোমারই ইষ্টের রূপ। মনে কর—তুমি যদি সমুদ্রের এক গণ্ডুষ জল হাতে করে বল—তুমি "গঙ্গাজল" হাতে করেছ—তুমি মিথ্যাবাদী নও, কারণ সমুদ্রের

মধ্যে গঙ্গা বিরাজ করছেন, তুমি যদি ঐরূপ সমুদ্রের জল হাতে করে' অগণিত নদনদীর নাম কর, কোথাও তুমি মিথ্যা-বাদী প্রমাণিত হবে না। কারণ সমস্ত নদনদী সম্মিলিত হ'য়েই ত সমুদ্র আকার ধারণ করেছে। এদিকে ভেবে দেখ অগণিত মূর্ত্তিই ত অব্যক্ত ব্রহ্মের বহির্বিকাশ। তোমার ইষ্ট দেবমূর্ত্তি যদি ব্রহ্ম হয় ও অভিন্ন হয়, বিশ্বদেব মূর্ত্তিগুলি তোমার কোন ইষ্টদেবমূর্ত্তি হবে না ? এই অবস্থায় উপনীত হ'লে, খৃষ্টান, মুসলমান যে কোন সম্প্রদায়ের দেবতার প্রতি তোমার উদার হিন্দুধর্ম্মের সাধনাবলে আর বিদ্বেষ থাক্‌তে পারে না। ইহাই দৈবযজ্ঞের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। সন্ন্যাসীগণ "কুটিচক" অবস্থায় কূটস্থ ব্রহ্মের ধ্যানস্থ হ'য়ে যে অবস্থা লাভ করেন, গৃহস্থগণ দৈবযজ্ঞের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হ'লে ঠিক সেই অবস্থা লাভ করেন।

৪। পিতৃযজ্ঞ,—পিতৃ শব্দের অর্থ,—পিতাপিতামহাদি উর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষগণ ও মাতামহাদিগণ; তাঁহাদিগকে তর্পণ করা, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি করা, তাঁহাদের প্রীতির জন্য দান করা—ইহার নাম মুখ্য পিতৃযজ্ঞ। নিজ নিজ বংশের ভাবধারা পরিত্যাগ না করা, বংশের উন্নতিসাধন করা, পূর্ব্ব-পুরুষগণের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা,—ইহা গৌণ পিতৃযজ্ঞ। অনেকে বলেন,—মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি করার কিছুই মূল্য নাই, উহা অর্থের অপব্যয় এবং স্বার্থপর ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণের অর্থাগমের একটী প্রশস্ত পন্থা। এইরূপ উক্তি যাঁহাদের মুখ থেকে

বাহির হয়, তাঁহারা অসুরপ্রকৃতি বলে মনে হয়। অসুরগণের কার্য্যই চিরদিন দেবদ্বিজের হিংসা করা। বর্ত্তমান যুগে অনেক ব্রাহ্মণই আচারভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত ও গায়ত্রীবর্জ্জিত হ'লেও এখনও এমন বহু ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁরা অতীতের আদর্শ সাম্‌নে রেখে গন্তব্য পথে চলেছেন। যাঁরা ত্যাগের প্রদীপে জ্ঞানের বর্ত্তিকা জেলে সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের আঁধারে-ঢাকা জীবগণের হৃদয় থেকে অন্ধকার দূরীভূত করে ভূদেব আখ্যা লাভ করেছিলেন, তাঁদের আদর্শকে বুঝতে হ'লে, নির্ম্মমব্যঙ্গের যবনিকা সাম্‌নে ফেলে দিলে চল্‌বে কেন? যে আদর্শ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে আদর্শ চিরদিনই আদর্শ। আদর্শকে উড়িয়ে দিয়ে কোন সভ্য-সমাজ চল্‌তে পারে না। ব্রাহ্মণ অর্থার্জ্জনের উদ্দেশ্যেই মৃত-ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা দেন নাই, উহার মধ্যে সত্য আছে। ব্রাহ্মণগণ শক্তিমান্‌ যজমানের পক্ষে স্বর্ণপাত্রে শ্রাদ্ধীয় পিণ্ডদানের উপদেশ দিয়েছেন, দানসাগরের ব্যবস্থা করেছেন, দীন-দুঃখি-ভিক্ষুকগণকে ভূরিভোজনে পরিতুষ্ট করবার ব্যবস্থা দিয়েছেন। পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানে কার্পণ্য কর্‌তে নিষেধ করেছেন। কৃপণতা বা বিত্তশাঠ্যের দ্বারা অভীষ্ট ফললাভ হয় না, ইহাও পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু যিনি অতি দরিদ্রব্যক্তি, তাঁকে দরিদ্রমতেই শ্রাদ্ধ করবার উপদেশ দিয়েছেন। অন্নহীন ব্যক্তিকে বালির পিণ্ড দিবার উপদেশ দিয়াছেন। তাহাতেও যিনি অসমর্থ, তাঁকে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ অশ্রুবর্ষণ কর্‌বার উপদেশ দিয়েছেনে, দীনদরিদ্র

সন্তানের এই সশ্রদ্ধ অশ্রুই পিণ্ডাকারে পিতৃলোকে উপস্থিত হ'য়ে তার পিতামাতার তৃপ্তি জন্মাইয়া দিবে। ইহাও আর্য্যঋষিগণ যুক্তিতর্কের দ্বারা অভ্রান্ত প্রমাণে বিধিবদ্ধ করে গেছেন। তবে যদি কোন দস্যুপ্রকৃতি পুরোহিত মহাশয় ধর্ম্মের মিথ্যা দোহাই দিয়া বিপন্ন দীনদরিদ্র যজমানের উপর অত্যাচার করেন তা হলে ইহার জন্য আদর্শ দায়ী হতে পারে না। যজমানগণ যদি মিথ্যা-কুসংস্কারজনিতদৌর্ব্বল্যে এ সব স্বার্থপর লোভী ব্রহ্মবন্ধুর সংসর্গ শাস্ত্রানুসারে ত্যাগ করতে সাহসী না হন, তা হলে সকলক্ষেত্রে যেমন দুর্ব্বল ব্যক্তি চিরদিন অত্যাচারিত হয়ে আস্‌ছে, এক্ষেত্রেও তাহাই হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র কি?

কেবল হিন্দুসন্তানগণই যে মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করে থাকেন, তাহা নহে। মৃতের উদ্দেশ্যে মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সভ্যসমাজের সকল সম্প্রদায়ই প্রকারভেদে কিছু না কিছু করিয়া থাকেন। তুমি অনেক লেখাপড়া শিখিয়াছ, শিক্ষিতসমাজে তোমার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র কি, তাহার মৌলিক উদ্দেশ্য কি, কিছুই অনুসন্ধান কর নাই, সে অবসরও হয়ত তোমার নাই। তুমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পক্ষপাতদোষদুষ্ট কটাক্ষপূর্ণ উক্তি পড়িয়া তোমার নিজ ধর্ম্মে কি আছে তাই মোটামুটি জানিয়া লইয়াছ। সেই সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছ। তাঁহারা যেখানে নিন্দা করিয়াছেন, পরমুখাস্বাদী হ'য়ে তুমিও নিন্দা করিতেছ, তাঁহারা যেখানে অর্দ্ধ সুখ্যাতি

করিয়াছেন, তুমিও ঠিক তাহাই করিতেছ। কাজেই মরা গরুতে ঘাস খায় না বলে তুমি শ্রাদ্ধাদি উড়িয়ে দিতে চাচ্ছ। ঐ দেখ, —হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সভ্য, অসভ্য সকল সম্প্রদায়ই মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান কর্‌ছেন। কোথাও গোরস্থানে নিয়মিত দিনে পুষ্পদান, ধূপদান, ভূরিভোজন, কোথাও শোক-চ্ছায়ার প্রতীক কৃষ্ণ-বসনে অঙ্গ ঢেকে, কৃষ্ণসূত্র হাতে বেঁধে, সমবেতভাবে সজল-নয়নে যুক্তকরে শোকসঙ্গীতে গির্জ্জায় দাঁড়িয়ে মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলিদান, আবার কোথাও বন্য-বরাহ হনন করে মৃতের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে বরাহ-শোণিত গর্ত্তে ঢেলে বরাহমাংসে পল্লীবাসীর তৃপ্তিসাধন। আবার কোথাও গঙ্গাতীরে দেবালয়ে, অথবা গোময়লিপ্ত প্রাঙ্গণে শালগ্রাম শিলার সম্মুখে নতজানু হয়ে সত্ত্বগুণোৎপাদক বিবিধ দ্রব্যের নিঃস্বার্থত্যাগে মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাদিদান। দেশ কাল পাত্র ভেদে নিজ নিজ সংস্কৃতির ভিতর দিয়া জগতের সভ্য অসভ্য সকলেই মৃতের তৃপ্তিজনক উদ্দেশ্যে কিছু না কিছু করিয়া থাকেন। তুমি উহা মিথ্যা ও অপব্যয় বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন?

আর্য্যঋষিগণ আধ্যাত্মিক জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, আত্মসম্বেদন দ্বারা দেখিয়াছিলেন, শাশ্বত এবং সত্য অনুভব করিয়াছিলেন,—একটি ক্ষীণাতিক্ষীণ স্পন্দনও ব্যর্থ হয় না, বিশ্ববক্ষে ছুটোছুটি করে থাকে, বাস্তব চক্ষে বিলীন মনে হলেও অনন্ত চক্ষুতে বিলীন হয় না। মৃতের নাম ও

গোত্র উচ্চারণ করিয়া বৈদিক মন্ত্রগুলি সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের ভার লইয়া তুমি যে স্পন্দন বা শব্দের সৃষ্টি করিলে, সেই শব্দতরঙ্গ মৃতব্যক্তি যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তা তাহার নিকট পৌঁছাইয়া যাইবে, এবং তাঁহার তৃপ্তি জন্মাইয়া দিবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা radio এর সাহায্যে ইহারই কতকটা সুপ্রমাণিত করিয়াছেন।

মনে কর,—তুমি একটী পুকুরের মাঝখানে একখানি ইট ছুড়িয়া ফেলিলে, জলের উপর একটি বৃত্তাকার (সর্ব্বতোমুখী) স্পন্দন উঠিল, উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আরও বৃহত্তর হ'তে হ'তে পুকুরের পাড়ের দিকে ছুটিল, বাধা পেয়ে ঐ স্পন্দন পাড়ের বুকে অদৃশ্য হইল, মনে হইল বটে উহা মিলাইয়া গেল, কিন্তু উহা থামে নাই, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বিশ্ববুকে ছুটিতেই থাকিল। আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলা যাক্,—সমগ্র জগৎ স্পন্দনময়, অব্যক্ত ব্রহ্মে বহু হবার ইচ্ছারূপ প্রথম স্পন্দন উঠিল ঐ স্পন্দনই ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতের ভিতর দিয়া সমগ্র বিশ্বকে গতিশীল করিয়া তুলিল। গুণভেদে রূপভেদ গ্রহণ করিল। সমুদ্রে বুদ্‌বুদ্ উঠার মত অসংখ্য জীবাত্মার সৃষ্টি হইল। ঐ মূল স্পন্দনই গুণান্বিত হয়ে খণ্ড খণ্ডরূপে অসংখ্য জীবের জীবত্ব বা জীবাত্মা। জীব গুণাতীত হলেই আবার ঐ মূল স্পন্দনে ফিরে এসে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়। অব্যক্তে মিলিত হয়ে অব্যক্ত হয়ে যায়। স্পন্দনকে মোটামোটী দুইভাগে

বিভক্ত করা যায়। একটী অনাহত অপরটী আহত। অনাহত স্পন্দন,—জীবাত্মা, হৃৎপিণ্ড, যাহা সর্ব্বদা ধুক্ ধুক্ করে জানিয়ে দিচ্ছে যে আমরা বেঁচে আছি। উহা কখন স্থূল শরীরে থাকে, যেমন আমরা রয়েছি, পুস্তক লিখ্‌ছি, কখনও স্থূল শরীরের সংস্কার নিয়ে সূক্ষ্ম শরীরে। আবার কখনও নূতন স্থূল শরীরে ফিরেও যায়, হয়ত বা কারণ শরীরে উঠেও যায়। স্থূল শরীরে যখন ফিরে আসে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারগুলি নিয়ে নাম ও রূপের ভিতর দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিৎস্বরূপে প্রকাশ হয়। যেমন আমরা বর্ত্তমানে রয়েছি। পূর্ব্বজন্মের সংস্কারগুলি, এমন কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের নাম গোত্র, সম্বন্ধ, ভাব, সবই আমার মধ্যে রয়েছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমি তাহা বলতে পারি না। বর্ত্তমান দেহের চক্ষুকর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বকের দ্বারা জন্মান্তরের সংস্কার-গুলিকে প্রকাশ করা যায় না। এই সব বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ ঠিক করা যায় না। আমাদের মধ্যে যে এক অতীন্দ্রিয় শক্তি আছে, তাহার দ্বারাই অনুভব করা যায়। আহত স্পন্দন—আঘাতের দ্বারা যে স্পন্দনের সৃষ্টি হয়, তাহাই আহত স্পন্দন। ওষ্ঠ দন্ত জিহ্বা তালু প্রভৃতির মিলিত আঘাতে যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা ভাবপ্রকাশস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ভাষা নামে কথিত, উহাও আহত স্পন্দন। আবার যে কোন দুই বা ততোধিক বস্তুর পরস্পর আঘাতে যে সকল তরঙ্গ উঠে, অর্থাৎ ভাষাহীন গতি, উহাও আহত স্পন্দন।

ইহাই বিশ্বের প্রাকৃতিক স্বভাব যে আহত স্পন্দন উহার সমজাতীয় সমসংস্কারাপন্ন অনাহত স্পন্দনের দিকেই আকৃষ্ট হয়। মৃতব্যক্তি মৃত্যুর পর যে ভাবেই জন্মগ্রহণ ক'রে থাকুন, বা জন্মগ্রহণ না করে থাকুন, স্থূলভাবেই থাকুন বা সূক্ষ্মভাবেই থাকুন, তাঁর যে পূর্ব্বজন্মের সংস্কারান্বিত জীবাত্মা বা অনাহত স্পন্দন, তাঁকে লক্ষ্য করিয়া তাঁর নাম গোত্র তদনুকূল মন্ত্রও শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যসামগ্রীর ভার লইয়া যে সৃষ্ট আহত স্পন্দন দূর দূরান্তরে অবস্থিত ঐ অনাহত স্পন্দনকেই আলিঙ্গন করে থাকে। আমার আর্য্যঋষিগণ ইহা আত্মসম্বেদন দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন সত্যদর্শন করিয়াছিলেন—তাই লিখিয়াছেন—

"পিতা যদি দেবো যাতি শুভকর্ম্মানুযোগতঃ। তস্যান্নম-মৃতং ভূত্বা দেবত্বেঽনুগচ্ছতি॥ দৈত্যত্বে মত্তরূপেণ পশুত্বেঽপি তৃণং ভবেৎ। মনুষ্যেঽপ্যনুগচ্ছন্তি হ্যন্নপানরসাদয়ঃ॥

পিতৃদেব স্বীয় সুকৃতিবশে যদি মৃত্যুর পর দেবতা হইয়া দেবলোকে থাকেন পুত্রের প্রদত্ত পিণ্ড দেবলোকে গিয়া অমৃতরূপে তাঁহার তৃপ্তিজনক হইবে। দৈত্যরূপে যদি অবস্থান করেন, মত্তের ভিতর দিয়া, পশুরূপে যদি অবস্থান করেন, তৃণের ভিতর দিয়া, মনুষ্যরূপে যদি অবস্থান করেন, অন্নপানীয় বিবিধ রসাদির ভিতর দিয়া পুত্রপ্রদত্ত পিণ্ড, তাহার পিতার তৃপ্তি জন্মাইয়া দিবে।

আমরাও অনেক সময় দেখিতে পাই বিবিধ মূল্যবান্ খাদ্যের মধ্যে যে তৃপ্তির সন্ধান পাই না, অথচ হঠাৎ একদিন

আলুভাতে ভাত খাইয়া পরম তৃপ্ত হই। এইরূপ পরিতৃপ্তির কারণ স্থূলতঃ আলুভাতের মধ্যে দেখ্‌তে পাই না বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম কারণ হচ্ছে,—আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সন্তানগণ কেহ না কেহ পিতৃযজ্ঞ করিয়াছেন।

আমি আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্থূলদেহত্যাগের সঙ্গে স্থূলভাব ত্যাগ করিয়া আসিলেও আমার অন্তঃকরণ, (মনঃ বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার) যাহাকে আমি এতক্ষণ অনাহত স্পন্দন বা জীবাত্মা বলিয়া আসিতেছি, বহু বহু জন্মের সঞ্চিত ভাব-গুলি ত্যাগ করিতে পারে নাই, যাহা উহার মধ্যে সংস্কার-রূপে স্তরে স্তরে সাজান আছে। আমার অন্তঃকরণ এ সঞ্চিত সাজান সংস্কারগুলিকে আমার বর্ত্তমান স্থূলাভিমুখী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু আমার অন্তঃকরণে এ পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া এক অতীন্দ্রিয় শক্তি আনে, যাহা সাধন ভজনের তারতম্য অনুসারে অল্প-বিস্তর অনুভূত হয়। সেই অন্তঃকরণ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটীর অপেক্ষা না রাখিয়া সেই অতীন্দ্রিয়-শক্তির প্রভাবে, আহত তরঙ্গের মধ্য হইতে নিজ সংস্কারের অনুরূপ বা সমজাতীয় ভাবগুলিকে আকর্ষণ করে বা ভাবগুলির দ্বারা আকৃষ্ট হয়। যিনি অতীন্দ্রিয়শক্তির পূর্ণ অধিকারী, তিনি বিশ্বের সকল তরঙ্গ হইতে সকল ভাবই ইচ্ছামত গ্রহণ করিতে পারেন। যাক্, সে অন্য কথা।

মনে কর,—অনেকগুলি লোক দেখিতেছ, তাদের মধ্যে ছ' একটি লোকের সঙ্গে তোমার ভাব করিতে ইচ্ছা হইল, ভাবও করিলে, একমূহূর্ত্তে ভালবাসাও জমিয়া গেল। অথচ তাহার অপেক্ষা অনেক গুণবান্ রূপবান্ শিক্ষিতলোকও সেখানে ছিল, তাদের অন্য কাহার প্রতি তোমার মোটেই রুচি হইল না। বল দেখি উহার কারণ কি? তুমি স্থূলভাবে উহার কোন কারণই দেখাতে পারবে না। অথচ এ অপরিচিত লোকটিকে ভালবেসে তুমি আনন্দ পাচ্ছ, তাহার কথাগুলি শুনে, হয়ত সে বাক্য এত কর্কশ, অন্যের পক্ষে কর্ণবিদারক, তুমি কিন্তু আনন্দে গলে যাচ্ছ। ইহার কারণ তোমার পূর্ব্বজন্মের অলক্ষিত প্রিয় বস্তুটী যে অন্যরূপে পেয়েছ। এ লোকটীর আগমনরূপ আহত স্পন্দন তোমার চক্ষুকর্ণের ভিতর দিয়া অন্তঃকরণে প্রবেশ করিল,—যেমন সকল ব্যাপারেই ঘটে থাকে, কিন্তু তোমার এ অন্তঃকরণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার-রাশি স্তরে স্তরে সাজান ছিল, অতীন্দ্রিয়শক্তির প্রভাবে সে তার সমজাতীয় আহত স্পন্দনকে আকর্ষণ করিল। তাই তুমি বাহ্যতঃ চিন্‌তে পারছ না, কিন্তু তুমি আনন্দে আপ্লুত হচ্ছ! মনে হচ্ছে যেন কতদিনের পরিচিত, কত আপনার লোক। এতে যুক্তি নাই, তর্ক নাই, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মর্য্যাদাবোধ নাই—তুমি আনন্দ পাচ্ছ।

এখানে কেহ প্রশ্ন করবেন,—এমন ব্যক্তি বর্ত্তমান আছে, যাঁকে বহুলোকেই ভালবাসেন, তবে কি তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে

বহুলোকের আত্মীয় ছিলেন? আমি বলি—হাঁ গো হাঁ, তিনি হয় জনপ্রিয় অজাতশত্রু নেতা ছিলেন, নয় মঙ্গলাকাঙ্খী বহু-লোকের গুরু ছিলেন। অথবা পূর্ব্বজন্মে বহুলোকের মঙ্গলের জন্য অসাধারণ ত্যাগের প্রদীপ জ্বালিয়া গিয়াছেন, সে আলোকে অগণিত নরনারী অন্ধকারে পথের সন্ধান পেয়েছে তাই আজ তিনি এত প্রিয়, তাঁর দর্শনে, স্পর্শনে জনগণ ধন্য হচ্ছেন, আবার তিনিও জনগণ-হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ খেলাচ্ছেন।

গৃহস্থগণ তাঁদের প্রত্যেক শুভকর্ম্মেরই পূর্ব্বে পিতৃযজ্ঞ করিয়া থাকেন। ঋষি বলিয়াছেন—নানিষ্ট্বা পিতৃন্ বৈদিক মারভেত। পিতৃগণকে পূজা না করিয়া বৈদিক কর্ম্ম করিবে না। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—কন্যাপুত্ররিবাহে তু প্রবেশে নব-বেশ্মনঃ। নামকর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা॥ সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখদর্শনে। নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযত্নো গৃহী। পুত্রকন্যার বিবাহে, নবগৃহ প্রবেশে, পুত্রের প্রথম মুখদর্শনে, গর্ভাধানাদি সকল সংস্কার কর্ম্মে, গৃহী নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃগণের পূজা করিবে। আনন্দের সময় তোমার পিতৃপুরুষকে ভুলিলে চলিবে না, যে শুভকর্ম্মে তুমি লিপ্ত হয়েছ, বহু অর্থ ব্যয় করিতেছ, তাহার অভ্যুদয়ের জন্যই ঋষিগণ পিতৃপূজা করবার আদেশ দিয়েছেন। ঐ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ বিশেষ অনুরাগের সহিত করিও, ঝঞ্চাট মনে করিয়া অশ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধ করিও না।

তুমি হয়ত' তথাকথিত বহু লেখাপড়া শিখিয়াছ, তোমার পিতার কষ্টার্জ্জিত অর্থ সাহায্যে বিলাত গমন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়া আসিয়াছ, কিন্তু তোমার পিতৃদেব হয়ত, দোকানে বসিয়া আলু বিক্রয় করেন, তুমি হয়ত বলিতে পার, এরূপ পিতাকে শ্রদ্ধা করিবার কি আছে, এরূপ পিতার ভাবধারা গ্রহণ করিয়া লাভ কি ? আমি বলি, ক্ষুদ্র বীজ হইতে মহান্ বটবৃক্ষের উদ্ভব, বটবৃক্ষের ঐ যে বিপুল বিস্তৃতি, ঐ যে বিরাটত্ব, ঐ ক্ষুদ্র বীজেই নিহিত ছিল। তোমার ঐ আলু-বেচা পিতার ময়লাকাপড় ঢাকা হৃদয়ে তোমাকে উচ্চ শিক্ষিত করবার ভাবধারা না থাকিলে তুকি কি উপায়ে শিক্ষিত হতে পারতে। কিন্তু তুমি এমন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এসেছ— তোমার দ্বারা পিতৃযজ্ঞ হওয়াত দূরের কথা, তোমার পিতাকে তোমার বন্ধুসমাজে পিতা বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হচ্ছ। যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন, তোমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন, যে সমস্ত শিক্ষক মহাশয়গণ তোমাকে হাতে খড়ি দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষায় সস্নেহে সহায়তা করেছেন, পাছে তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত হয়ে পড়লে, তোমাকে একটু সামাজিক সম্মান দেখাতে হয়, তাই তুমি সর্ব্বদাই তাঁদের এড়িয়ে চল। বর্ত্তমানে জড়বিজ্ঞানের যুগে প্রতি বৎসর হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক বিদ্যার্থী হয়ে বিলাত যাচ্ছেন। কিন্তু তোমার মত কয়জন নিজ ভাবধারা হারিয়ে আসেন। আমি বলি, ভাবধারা ও জাতি, একই বস্তু। যিনি

ভাবধারা হারিয়ে আসেন তাঁরই জাত যায়। অনেক মনীষী বিলাতফেরতের সঙ্গে আমার আন্তরিক সৌহৃদ্য আছে; তাঁদের সহিত কথাবার্ত্তায় আমার সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মিয়াছে যে মাত্র দু'চার জন ব্যতিরেকে সকলেই ভাবধারা বাঁচিয়ে চলে এসেছেন। তাঁরা সাধারণের চেয়ে হিন্দুধর্ম্মে কম অনুরাগী নহেন। আমার ব্যক্তিগত মত—তাঁরা জাতিচ্যুত হয়ে আসেন নাই, বরং বর্ত্তমান যুগে জাতির মেরুদণ্ড হয়েই এসেছেন। জননীর মলমূত্রে পরিপুষ্ট জীব, যদি সাধনবলে মহাপুরুষত্ব লাভ করেন এবং তিনি যদি সেই জননীকে কামিনী বলে অবজ্ঞা করেন, আমার মনে হয়, ওগো, অমন মহাপুরুষের ছায়াস্পর্শ করা উচিত নয়। সে সংসর্গে তোমার সত্যকার জাত যাবে, দেশের সর্ব্বনাশ হবে, হিন্দুধর্ম্ম তার বৈশিষ্ট হারাবে।

যেমন স্বামী কুরূপ মুর্খ, দরিদ্র বা রোগী হইলে তাহাকে ত্যাগ করিয়া সুন্দর বিদ্বান্ ধনী ও স্বাস্থ্যবান্ স্বামী গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্রে নাই, তেমনি পিতা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ অর্থহীন বা মুর্খ হইলে তাহাকে বদ্‌লাইবারও ব্যবস্থা নাই। তোমার অপেক্ষা তোমার পিতার যদি আর্থিক অবস্থা বা আক্ষরিক জ্ঞান কিছু কম থেকে থাকে, তথাপি তোমাকে পিতৃযজ্ঞ করতেই হবে। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। উত্তেজিতশোণিতধারার চাঞ্চল্যে যদি আজ ইহা বুঝিতে না পার হতাশ হয়ো না, বৎস, রক্ত স্নিগ্ধ হলে তুমিও

তোমারই মত যুবক পুত্রের পিতা হলে বুঝ্‌তে পার্‌বে গার্হস্থ্যধর্ম্মে পিতৃযজ্ঞের কি প্রাণস্পর্শী সার্থকতা।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকালে সমস্ত অন্তরটুকু দিয়ে কৃতজ্ঞতার অশ্রু মিশিয়ে যিনি পিণ্ডদান কর্‌তে পারেন, তিনিই কেবল পিতৃযজ্ঞের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ। বহুবিধ শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্রে আছে, সকলগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সকলের পক্ষে সম্ভব না হতেও পারে; কিন্তু প্রত্যেক মৃতপিতৃক হিন্দুসন্তান ইচ্ছা কর্‌লেই প্রতি বৎসর মৃত-তিথিতে একটী করিয়া একোদ্দিষ্ট অনায়াসেই কর্‌তে পারেন। সেটুকুও যাঁরা না করেন, গার্হস্থ্যধর্ম্মে তাঁরা অত্যন্ত পাপভাগী হয়ে পড়েন। যাঁদের পিতামাতা বেঁচে আছেন, তাঁরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁদের সেবা করিয়া ধন্য হইবেন—ইহা বলাই বাহুল্য।

৫। ভূতযজ্ঞ,—ভূত শব্দের অর্থ,—ক্ষিতি (মাটি), অপ্‌ (জল), তেজঃ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু), ব্যোম (আকাশ); ইহাদের যজন করার নাম ভূতযজ্ঞ। যাবতীয় জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, সাগর, ভূধর সমস্তই পঞ্চভূতাত্মক। মনুষ্যও সর্ব্বভূতের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল; বিশিষ্ট চৈতন্যের বিশিষ্ট যজন হিসাবে নৃযজ্ঞকে পৃথক করা হয়েছে। নৃযজ্ঞের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশিষ্টচিচ্ছক্তিসম্পন্ন মানুষের সেবা করা, ভূত-যজ্ঞের দ্বারা মানবের হিতকর জীবজন্তু বৃক্ষলতাদির সেবা করা, উহা পারম্পর্য্যসম্বন্ধে ঐ নৃযজ্ঞেরই সহায়তা করা হয়ে থাকে।

গোসেবা, বৃক্ষাদিরোপণ, জলাশয়প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জনহিতকর যাবতীয় কার্য্য সবই ভূতযজ্ঞ। এই ভূমণ্ডলে অতিক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ যতকিছু বস্তু সৃষ্ট হয়েছে, প্রত্যেকটীর প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও সম্বন্ধ আছে। আমরা স্থূলদৃষ্টিতে মনে করি, এই গাছটা, এই লতাটা, এই জন্তুটা, এই কীট পতঙ্গটার সঙ্গে আমাদের কি প্রয়োজন আছে যে, সৃষ্টি কর্ত্তা ঈশ্বর এইগুলি সৃষ্টি করলেন। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, একটু গবেষণা করিলে দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—ঈশ্বরের বিশ্বরচনা, তাঁহার রক্ষাপ্রণালী এবং তাঁহার ধ্বংসসাধন—এ সব সৃষ্টবস্তুর সঙ্গে পরস্পর ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। কতকগুলি বৃক্ষলতা আমাদের প্রাণ বাঁচাচ্ছে, আমরাও আবার তাদের বাঁচিয়ে রেখেছি। আমরা সকলেই ধ্বংসের সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হয়ে বেঁচে আছি। যে দিন লড়ায়ে হেরে যাব, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের শরীরস্থ বিরুদ্ধ জীবাণুগুলি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, আমলকী ও অশোক, প্রভৃতি বৃক্ষগুলির দ্বারা বায়ু বিশেষভাবে বিশুদ্ধ হইয়া বহু বীজাণুর ধ্বংস করিয়া বহু রোগের কবল হইতে আমাদের রক্ষা করে। তাই সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ বেদ পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রের ভিতর দিয়া সর্ব্বভূতের উপকারার্থে ঐ সমস্ত বৃক্ষকে বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সযত্নে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্রুতিমূলক উপদেশ দিয়াছেন। ঐ সমস্ত বৃক্ষের পত্রসঞ্চালনে বায়ু

সুপবিত্র হয়। সুপবিত্র বায়ু, স্বাস্থ্যরক্ষার ও আধ্যাত্মিক চিন্তার পরম বন্ধু। আমাদের দেহস্থ বায়ু প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, ইত্যাদি স্থানভেদে রূপভেদ গ্রহণ করিয়া, এই পাঁচটী ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উপবিতধারীগণ প্রত্যহ ঐ পঞ্চবায়ুর যজন করিয়া থাকেন। খাদ্যগ্রহণের প্রথম অংশ ঐ পঞ্চবায়ুর উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়া আহার্য্য গ্রহণ করেন। উহাকে চলিত কথায় "গণ্ডুষ করা" বলা হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানতন্ত্রে লিখিত আছে,—আকাশাজ্জায়তে বায়ু বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ। রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী।

মহী সংলীয়তে তোয়ে, তোয়ং সংলীয়তে রবৌ। রবিঃ সংলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্নভসি লীয়তে॥ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রবি অর্থাৎ তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, জল হইতে মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। আবার মৃত্তিকা জলে বিলীন হয়ে বায়, জল অগ্নিতে (তেজে) বিলীনতা প্রাপ্ত হয়, অগ্নি বায়ুতে বিলীন হয় এবং বায়ু আকাশে বিলীন হইয়া যায়। তাহা হইলেই দেখা যায়, বায়ু সুপবিত্র হলে অগ্নি, জল, মৃত্তিকা সবই সুপবিত্র হয় এবং উহা হইতে উৎপন্ন সকল বস্তুই সুপবিত্র হয় এবং আবহাওয়া ও সুপবিত্র হয়। ঐ সমস্ত সুপবিত্র হলে মানুষও সুপবিত্র হয়।

উদ্ভিদ ব্যতিত বায়ুকে কেহ সুপবিত্র করিতে পারে না, আবার উদ্ভিদের মধ্যে পঞ্চবটি বৃক্ষগুলি বায়ুশোধনে অদ্বিতীয়

শক্তিমান্। সর্ব্বভূতোপকারক ঐ পবিত্র বৃক্ষগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মীয়বোধে নারায়ণজ্ঞানে পূজা করিবার ব্যবস্থা আছে। ওগো আত্মীয়তা স্থাপন কর্‌তে না পার্‌লে আদর যত্ন শ্রদ্ধা গাঢ় হয় না। ঐ আত্মীয়তা স্থাপন হয় বলেই আজও পুণ্যাহমাসে প্রত্যহ অগণিত ধর্ম্মপিপাসু নরনারী অশ্বত্থাদিবৃক্ষমূলে জলদান না করিয়া জলগ্রহণ করেন না।

ঐ সব যাজ্ঞিক বৃক্ষ আমাদের কত প্রিয়, কত উপকারী ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জগতের কত নিকট আত্মায়, কতখানি প্রাণদিয়া আর্য্যঋষিগণ ঐ সব বৃক্ষকে ভালবাস্‌তেন শ্রদ্ধা কর্‌তেন, একটু লক্ষ্য কর্‌লে ঋষিচরণে স্বতঃই মস্তক অবনত হয়ে পড়ে। দুর্গামহাপূজায় একটী বিল্বশাখার প্রয়োজন: ঐ বিল্বশাখায় চামুণ্ডার পূজার ব্যবস্থা। চির মঙ্গলব্রতী বিল্ববৃক্ষ হতে একটি শাখা ছেদন কর্‌তে ঋষির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল—তাই ঋষি বিনয়নম্রকণ্ঠে করযোড়ে একটী শাখা ছেদন কর্‌তে গিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন।

বিল্ববৃক্ষ মহাভাগ! সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ। গৃহীত্বা তব শাখাঞ্চ দুর্গাপূজাং করোম্যহম্। শাখাচ্ছেদোদ্ভবং দুঃখং ন চ কার্য্যং ত্বয়া প্রভো। দেবৈর্গৃহীত্বা তে শাখাং পূজ্যা দুর্গেতি বিশ্রুতিঃ॥

হায়, অধঃপতিত আমাদের হিন্দুসমাজ! হায় অবিদ্যা-কবলিত নেতৃবৃন্দ! আজ কত কত পশু ভাবাপন্ন জীব তোমাদের চোখের সাম্‌নে শত শত প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ বৃক্ষের

শাখা ও পত্র ছেদন করে নিয়ে যাচ্ছে—তাদের ছাগ মেষের উদরপূর্ত্তির জন্য। অস্বামিক দ্রব্য যেমন ভাবে লুণ্ঠিত হয়, নাবালক শিশুর বিধবা মাতার সম্পত্তি যেরূপভাবে লুণ্ঠিত হয়, ঠিক তদ্রূপভাবে তোমার এ ধর্ম্মবৃক্ষগুলি—তন্ত্রমতে তোমার এ কুলবৃক্ষগুলি—তোমার চিরারাধ্য নারায়ণরূপী বৃক্ষগুলির অঙ্গচ্ছেদ হচ্ছে। ছিন্নাঙ্গ বৃক্ষগুলি রক্তরাগরঞ্জিত হ'য়ে তোমাদের অধঃপতন দর্শনে নীরবে রোদন করছে। এ কেবল নির্ব্বাণপ্রায় হিন্দুসমাজেই সম্ভব হচ্ছে, অন্য কোন সম্প্রদায় ইহা সহ্য করে না, বা তাদের ধর্ম্মবৃক্ষের অঙ্গচ্ছেদ করতে কোন ব্যক্তিই সাহসী হয় না।

বৃক্ষাদিরোপণ দ্বারা শস্যাদির উৎপাদন ও গোসেবা ভূতযজ্ঞের অন্যতম অঙ্গ। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থই এই ভূতযজ্ঞ অল্পবিস্তর করিয়া থাকেন। আর্য্য ঋষিগণ দেব-সেবার মত গোসেবার অনুষ্ঠান করতেন। প্রত্যেকদিন গাভীগুলিকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করতেন আরত্রিক করতেন। পূজায় প্রসন্নবাণী হয়ে গোমাতা সাধককে অভীষ্ট ফলদান করতেন। পাপীর হাত থেকে মন্ত্রপূত গোগ্রাস গ্রহণ ক'রে পাপীকে পাপমুক্ত করতেন। হে সাধক! তুমি যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে, তোমার যখন বড় অসহায় অবস্থা, তোমার কণ্ঠ শুষ্ক ও তোমার প্রসবিত্রী মাতা চৈতন্য-হারা, কে তোমাকে এক বিন্দু শুদ্ধসত্ত্ব দুগ্ধদান করে সেই অসহায় অবস্থায় প্রাণ বাঁচিয়ে দিল? ঐ আর্য্য ঋষি-

পূজিত গোমাতা, ভগবতী দেবতা, যাকে তুমি ব্যবসায় বুদ্ধি দিয়ে আজ প্রতিপালন করছ। গোমাতার কি অসাধারণ ত্যাগ—তুমি ধান্য গ্রহণ কর, তাহাকে পোয়াল দাও; তুমি চাউল গ্রহণ কর, তাকে কুড়া দাও। তুমি ডাউল খাও, তাকে ভূষি দাও; তুমি তৈল গ্রহণ কর, তাকে খৈল দাও; তুমি ভাত খাও, তাকে ফেন দাও। তোমার পরিত্যক্ত আবর্জ্জনার বিনিময়ে গোমাতা তোমাকে কি দেন—"পয়োঽমৃতং হবির্হি-প্রাণিনামায়ু", অমৃত স্বরূপ দুগ্ধ দেন,—একমাত্র দুগ্ধসেবন করিয়া যে কোন ব্যক্তি চিরজীবন বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। ঘৃতই প্রাণীগণের পরমায়ুঃ। তিনি তোমাদের পরমায়ুঃ দান করেন এবং ক্ষীর নবনী ছানা, দধি ইত্যাদি সত্ত্বগুণপ্রধান শ্রেষ্ঠ ভোগ্যবস্তু দিয়া থাকেন। ইহাই দেবতার লক্ষণ—যিনি অল্পবস্তু পাইয়া অথবা কিছু না পাইয়াও প্রতিদানের অপেক্ষা না রাখিয়া, স্ব-স্বভাবগুণে প্রাচুর্য্যদানে পরিতৃপ্ত করেন। তিনি যেই হউন, আমি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানিয়া লইতে আনন্দ বোধ করি। ওগো সাধক! একবার চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া দৃষ্টিপাত কর,—প্রতিদানের অপেক্ষা না রাখিয়া স্ব-স্বভাবগুণে সূর্য্য আমাদের আলোক দেন, বায়ু আমাদের প্রাণ রক্ষা করেন, গাভী আমাদের দুগ্ধ প্রদান করেন, ক্ষেত্র আমাদের শস্য দেন, মাতা আমাদের স্তন্যপান করান, পিতা আমাদের প্রতিপালন করেন, এবং শ্রীগুরুদেব আমাদের আধ্যাত্মিক পরজ্ঞান দেন। এইগুলি হিন্দুর দেবতা।

দিবারাত্র হিন্দুসন্তান এই পঞ্চযজ্ঞের ভিতর দিয়া ঐ দেবগণেরই পূজা ক'রে থাকেন। হিন্দুসন্তানগণ যা কিছু করেন, উহা ব্যষ্টির ভিতর দিয়া সমষ্টির পূজা করেন, নদীর ভিতর দিয়া সমুদ্রের পূজা করেন এবং জীবের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকেই পূজা করেন। সর্ব্বভূতে বিরাজমান ঈশ্বরকেই উল্লিখিত পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানে পূজা করে একদিন হিন্দুসাধক বলেছিলেন,—প্রাতঃ প্রভৃতি সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্। প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্নকাল পর্য্যন্ত, আবার সায়াহ্নকাল হইতে পুনঃ প্রাতঃ কাল পর্য্যন্ত, আমি যা কিছু করি, ওগো, জগদীশ্বরী, ওগো, মা, সবই তোমার পূজা। গৃহস্থগণ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত থেকে ঠিক যখন এই অবস্থায় উপস্থিত হবেন, কোথাও দোষ দেখবেন না, সবই ব্রহ্মময়ীর মূর্ত্তিদর্শন করবেন, শত্রুমিত্রভাব বর্জ্জন ক'রে সকলকে ভক্তিভাবে সেবা করবেন, তখনই পঙ্কগড়ুক (পাঁকালমাছ) হবেন এবং সন্ন্যাসিগণের "হংস" অবস্থা প্রাপ্ত হবেন। গৃহস্থগণ মোহান্ত হবেন।

শাস্ত্রে উক্ত আছে,—পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠানকারী গৃহস্থ সর্ব্ব-পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ইহলোকে সুখভোগ করিয়া অন্তে সদ্‌গতি লাভ করেন।

যার যেমন অবস্থা, তদনুরূপ যথাশক্তি প্রত্যেক গৃহস্থের এই পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান একান্ত করণীয়। অনেকেই অল্পবিস্তর করে

থাকেন। নাম যশঃ খ্যাতি প্রতিপত্তির দিকে মুখ্য লক্ষ্য না রাখিয়া যদি একটু ভক্তিভাবে এই পঞ্চযজ্ঞের ভিতর দিয়া ঈশ্বরেরই উপাসনা হইতেছে এইরূপ মনে করিয়া লওয়া হয়, তা হইলে ঐ মনে করার অভ্যাসগুণে এই পঞ্চযজ্ঞের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইবে, এবং উহা চৈতন্যময় হইয়া একদিন সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষের চরণে সমাহিত হইবে।

কেহ প্রশ্ন করেন,—পঞ্চযজ্ঞের প্রত্যেক কার্য্যকেই যদি ঈশ্বরোপসনা ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তস্কর দস্যু দুর্বৃত্ত, নারীনির্য্যাতনকারীগণকেও নৃযজ্ঞের তালিকাভুক্ত করিয়া ঈশ্বরের প্রতীক বিবেচনায় কিছু বলা চলে না। এইভাবে নৃযজ্ঞের অনুষ্ঠানচালনে দুর্ব্বৃত্তেরা কি সুযোগ গ্রহণ করিবে? ইহার উত্তরে বলা যায়—দুর্বৃত্তেরা নিশ্চয়ই সুযোগ গ্রহণ করিবে, এবং বর্ত্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই করিতেছে। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে—ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী জীবগণকে একটা জড় প্রস্তর বা কাষ্ঠের মত গঠন করিয়া তোলা। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি পঞ্চযজ্ঞের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত ধর্ম্মানু-ষ্ঠান ত প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, যেটুকু আছে, তাহাও প্রাণহীন, তাই আজ দেশ এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ব্বল ব্যক্তির ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা কোথায়? দুর্ব্বল ও দরিদ্রের ধর্ম্মই বা কি? সবল ব্যক্তিই আত্মসম্বেদন লাভ করেন। "নায়মাত্ম বলহীনের লভ্যঃ"—এই উপনিষদবাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

মনে কর, তোমার ঘরে আজ একজন সাধুপ্রকৃতি অতিথি উপস্থিত হয়েছেন, তুমি তোমার সাধ্যানুযায়ী পাদ্য, আসন, অন্নব্যঞ্জনপ্রভৃতি স্থিতিমূলক দ্রব্য দিয়া তাঁকে সেবা করিয়া ঈশ্বরসেবা হইল মনে করিলে। একজন দস্যু কিংবা একজন কামাতুর দুর্ব্বৃত্ত তোমার ঘরে আসিয়াছেন, লাঠিঠাঙ্গা প্রভৃতি সংহারমূলক দ্রব্য দিয়া সেই দুর্ব্বৃত্ত অতিথিকে বিতাড়িত করিয়া ঈশ্বরসেবা হইল মনে করিতে আপত্তি কি? উৎপত্তি ও স্থিতিকে পূজা করিবার যেমন ব্যবস্থা আছে, হিন্দুধর্ম্মে সংহারকে পূজা করিবার ব্যবস্থা ঠিক তেমনি আছে। ত্রিগুণাত্মক ঈশ্বর সকল গুণেই ত অবস্থান করছেন। অব্যক্ত ব্রহ্ম, "বহু" হবার ইচ্ছায় ব্যক্ত হয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সংঘটন করছেন। উৎপত্তির দেবতা— ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা রজোগুণাত্মক রক্তবর্ণ। জলপূর্ণকমণ্ডলুহস্তে. (বিনারসে উৎপত্তি হয় না তাই রসাধার কমণ্ডলু) স্থিতির দেবতা—বিষ্ণু সত্ত্বগুণাত্মক নীলবর্ণ; তাঁর হস্তে (কর্ম্মশক্তি)— শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। শঙ্খ হর্ষজনক, পদ্ম—গন্ধ অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুখাদ্যদ্রব্যাদি। চক্র ও গদা সংহারের সঙ্গে সর্ব্বদাই যুদ্ধে রত; একটু অসাবধান হলেই সংহার আসিয়া স্থিতিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। পূর্ব্বেই বলেছি ধ্বংসের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছি। সংহারের দেবতা মহেশ্বর শ্বেতবর্ণ ও তমো- গুণাত্মক; তাঁর হস্তে ত্রিশূল। দেবাদিদেব মহাদেব— আত্মভোলা দেবতা। ত্রিশূলটীর আধ্যাত্মিক ব্যাখা ব্যবহারিক

জগতে নাই টেনে আনিলাম; তিনি আচণ্ডালব্রাহ্মণ সকলের উপাস্যও তিনি ভোলানাথ। তাঁর হাতে আত্মরক্ষার্থ ত্রিশূল কেন? প্রয়োজন হলেই তিনিও ত্রিশূলের খোঁচায় বোম-বোমরবে ত্রিভুবন আলোড়িত করে তোলেন। শিবকে পূজা করলেই তাঁর সংহারশক্তি ত্রিশূলকেও পূজা করতে হয়। সংহারকে পূজা করবার বিধি একমাত্র হিন্দুধর্ম্মেই দেখা যায়। গৃহস্থ! আততায়ীকে সংহার করিলে কোন পাপই হয় না; বিধিপূর্ব্বক সংহারকে পূজা করিলে ঈশ্বর প্রীতই হইবেন।

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতং।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাহবিচারয়ন্ ॥
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন ॥ মনু ৮।৩৫০-১॥

গুরুজনই হউন, বালক বা বৃদ্ধই হউন অথবা শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণই হউন—যদি তাঁরা আততায়ী হন,—সম্মুখে প্রাপ্তি মাত্রেই বুদ্ধিমান্ পুরুষ আত্মরক্ষার্থ বিনাবিচারেই তাকে নিধন করিবেন, এইরূপ সংহারে কোন পাপ নাই। আততায়ী কাহাকে বলে—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ। যে লোক আগুণ লাগাইয়া পুড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করে, বিষদান করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করে ধনসম্পত্তি ভূসম্পত্তি ও স্ত্রীকন্যামাতাভগিনী প্রভৃতি নারী অপহরণের চেষ্টা করে, তাহাদিগকে আততায়ী কহে।

তোমার চোখের সাম্‌নে দুর্ব্বৃত্ত আসিয়া তোমার স্ত্রীকন্যা-দের বলপূর্ব্বক অপহরণ কর্‌বে, তোমার ক্ষুধিত মুখের গ্রাসদস্যুতে কেড়ে নেবে, তুমি চক্ষুঃ মুদ্রিত করে বল্‌বে—সবই তাঁর ইচ্ছা। মা হিংসীঃ সর্ব্বভূতানি অর্থাৎ কাহাকেও হিংসা করিও না। ইহা গৃহস্থের ধর্ম্ম নহে, গৃহস্থের ধর্ম্ম—আততায়ী ভিন্ন অন্য কাহাকেও হিংসা না করা। তোমার পঞ্চযজ্ঞের প্রাণপ্রতিষ্ঠা না হলে ঠিক হয়ত বুঝ্‌তে পার্‌বে না। অন্যায়কে সমর্থন করা, মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া ধর্ম্ম নহে, অবিধিকে পূজা করা বিধি নহে। তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রেখো,—তুমি বেঁচে আছ তোমার প্রতিকূল জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করে। কাহাকেও হিংসা করিও না, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে তুমি একপলও বাঁচতে পারনা। "মা হিংসীঃ সর্ব্বভূতানি" ইহার প্রকৃত অর্থ পূর্ব্ববচনের সঙ্গে একবাক্যতা রাখিয়া ইহাই দাঁড়ায়—আততায়ী ভিন্ন জগতের একটি কৃমিকীটকেও নিজপ্রচেষ্টায় হিংসা করিও না। কিন্তু তাই বলিয়া প্রত্যক্ষ সুনিশ্চিত প্রমাণ না পাইয়া কোন ব্যক্তিকে অনুমানে বা কল্পনায় আততায়ী মনে করিয়া বিরুদ্ধাচরণ করিও না। অপরাধী ব্যক্তি শাস্তি না পায় সেও বরং ভাল নিরপরাধ ব্যক্তির একটি কেশস্পর্শ করিও না। হিন্দু ঋষিগণের ধর্ম্ম মানুষকে জড় করে তোলা নহে, ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দেওয়া নহে, জড়ত্ব থেকে ও ধ্বংস থেকে মানুষকে সবল ও শক্তিশালী করে গঠন করা।

জপযজ্ঞ।

মনঃস্থির না হলে আধ্যাত্মিক অনুশীলনে উন্নতিলাভ করা যায় না। চঞ্চল মনকে স্থির করিবার মোটামুটী দুটী প্রক্রিয়া আছে, প্রথমটী প্রাণায়াম, দ্বিতীয়টী জপ্। প্রাণায়াম শব্দের অর্থ,—এমন একটী অনুশীলন বা অভ্যাস, যাহার দ্বারা প্রাণ বায়ু স্থির হয় প্রাণের আয়াম অর্থাৎ আকৃষ্টি। কিন্তু ঐ প্রাণায়াম শিক্ষাটী খুব সহজসাধ্য নহে, উহা তরুণ বয়সেই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করে শিখ্‌তে হয়। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে, কঠিন দুরারোগ্য ব্যধি এসে দেখা দেয়। মনঃস্থির কর্‌তে হলে জপই গৃহস্থের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ মার্গ। কলিযুগে স্বল্পায়ু জীবের পক্ষে বিশেষতঃ গৃহস্থের পক্ষে মনঃস্থির কর্‌তে জপই যে একমাত্র নিরাপদ পথ, তা যজ্ঞেশ্বর শ্রীভগবান্ বহুযজ্ঞের কথা নিজমুখে ব্যক্ত করেও উদাত্ত-কণ্ঠে উচ্চারণ কর্‌লেন—যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি। তাঁর সমস্ত প্রাণটুকু নিঙ্‌ড়ে তাঁর প্রাণের গৃহস্থ ভক্তকে শুনিয়ে দিলেন—হে অর্জ্জুন! সকল যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ।

ব্রহ্মজজ্ঞ, নৃজজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ইহা ত গৃহস্থের অবশ্যকরণীয়। তারপর বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি অগণিত যজ্ঞাবলী যাহা বৈদিকযুগে ও পৌরাণিক-যুগে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রাণপাতপরিশ্রমে,

আড়ম্বরে ও অজস্র অর্থব্যয়ে অনুষ্ঠিত হত, এই সমস্ত যজ্ঞ অপেক্ষা জপযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করলেন—কলিযুগের প্রারম্ভে ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে শ্রীভগবান্। কেবল জপ কর, জপ কর, জপ অভ্যাস হলেই ধ্যান হবে, ধ্যানের অভ্যাস হলেই ধারণাশক্তি এসে দেখা দেবে। তখন আধ্যাত্মিক শক্তিলাভ কর্‌বে। যা চাও তাই পাবে। এমন পাবে, যা পেলে আর কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। কি মধুর আশ্বাসবাণী! এই একটী বাণী শত বৎসরের অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন মনকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে; গাঢ় অন্ধকারের বুক চিরে উষার আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হয়। দয়াল বলেছেন—যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি। আকুলপ্রাণে জপ কর—শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, ভ্রমণে, কর্ম্মানুসন্ধানে, লাভে অলাভে জয়ে, পরাজয়ে, হর্ষে, শোকে যে যে অবস্থায় আছ জপ কর—তোমার সমস্ত বিপদ কেটে যাবে। যতটুকু প্রাণ নিঙড়ে জপ কর্‌বে ততটুকু রস পাবে। অধিকারীভেদে বাচিক, উপাংশু ও মানস নামে এই জপযজ্ঞ ত্রিধা বিভক্ত। একলা নাম কর্‌তে ভাল না লাগে, রুচিপ্রদ না হয়, আলস্য আসে, পাঁচজনকে ডাক, একতালে একসুরে সুর মিশিয়ে একপ্রাণে উচ্চকণ্ঠে ডাক, নাম উচ্চারণ কর। আকাশ বাতাস মুখরিত হক; ভবতু মধুমৎ পার্থিবং রজঃ,—ধরাবক্ষের ধূলিকণা পর্য্যন্ত আনন্দময় হয়ে উঠুক। ইহারই নাম বাচনিক জপযজ্ঞ আবার ইহাকেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত "নামযজ্ঞ" ও বলে।

এই জপযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারাই তপস্যা, হোম, পুণ্যতীর্থে স্নান, সদাচার বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; সে কথা অশেষ জ্ঞানাকর শ্রীমদ্‌ভাগবতগ্রন্থে উদগীত হয়েছে। "অহোবত শ্বপচোঽপি ইতরোঽপি গরিয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেষু কপস্তে জুহুবুঃ সন্তোঽনার্য্যা ব্রহ্মান-মানর্চ্চুর্নাম গৃহ্ণন্তি যে তে॥ যাহার রসনাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান থাকে, সে জাতিতে চণ্ডাল হলেও অস্পৃশ্য হলেও মানবশ্রেষ্ঠ। যাহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন অর্থাৎ যপজজ্ঞের অনুশীলন করেন, তাঁহারাই কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যা, তীর্থস্নান, সদাচার ও বেদাধ্যয়ন করেন। অর্থাৎ এগুলি আর পৃথকভাবে করিতে হয় না। কেবল তাহাই নয়—উক্ত গ্রন্থে আরও উক্ত হয়েছে যে কলিযুগে জপযজ্ঞই পরিত্রাণের সহজ উপায়। কলের্দ্দোষনিধেঃ রাজন্নস্তি হোকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥ কলিযুগ অশেষ দোষদুষ্ট হলেও তার একটী মহান্ গুণ এই যে শ্রীকৃষ্ণের গুণানুকীর্ত্তনের দ্বারাই বন্ধনমুক্ত হয়ে পরমধামে গমন করা যায়।

তন্ত্রেও এবিষয়ে শ্রীসদাশিব ভীমভৈরবকণ্ঠে জপমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করেছেন। "জপাৎসিদ্ধি র্জপাৎসিদ্ধিঃ র্জপাৎসিদ্ধিঃ ন সংশয়ঃ।" জপাদৃতেঽন্যকর্ম্মণি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্। দিগন্তপ্রসারী শাস্ত্রসমুদ্রের যে দিকে তাকাই অগণিত তরঙ্গমালা ভিন্নমুখী হলেও, তাদের অন্তরে ঐ এক সুর বেজে উঠ্‌ছে "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি।"

উপাংশু জপ—জিহ্বার সাহায্যে অস্ফুট যে উচ্চারণ, যাহা কোনগতিকে নিজে শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাতে ওষ্ঠ কম্পিত হইবে না। এই উপাংশু জপ সাধারণ গৃহস্থের সাংসারিক উন্নতির দিক দিয়ে বিশেষ ফলদায়ক। উপযুক্ত আসনে বসিয়া মালা লইয়া এই জপ করিতে হয়। নিজ নিজ শ্রীগুরুদেবের নিকট শিখিয়া লইবে। প্রত্যহ জপের সংখ্যা রাখিবে। এইভাবে এককোটী জপ সমাধা করিতে পারিলে, পুরশ্চরণ প্রভৃতি আর কিছুই করিবার প্রয়োজন হয় না, মন্ত্রসিদ্ধি আপনা হইতেই আসিয়া যায়। যাক্ সে অন্য কথা।

মানসজপ—মনে মনে উচ্চারণ করার নাম মানসজপ। হৃৎপিণ্ডে যে অনাহত ধ্বনি সর্ব্বদাই হচ্ছে, অভ্যাসের দ্বারা ঠিক করে নাও, ঐ ধ্বনিই তোমার শ্রীগুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের ধ্বনি। মনের সাহায্যে দীর্ঘদিন অভ্যাস করতে হয়। ঐ অভ্যাস এমন হয়ে যাবে, মনঃ আপনা আপনি স্থির হয়ে জপ হতে থাক্‌বে। সেইটী আবার শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে অভ্যাস সিদ্ধ হলেই অজপা সিদ্ধ হওয়া যায়। বিশিষ্ট অনুরাগের সহিত অভ্যাসের ফলেই মনঃস্থির হয়। মনঃস্থিরের দ্বিতীয় উপায় নাই। অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন। 'অভ্যাসেন চ কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে'॥

আমাদের শরীরে কোটী কোটী সূক্ষ্মস্নায়ু আছে, প্রত্যেক স্নায়ুর ভিতর দিয়া কোটী কোটী রক্তকণা প্রবাহিত হচ্ছে। যাহার গতি আছে, তাহার শব্দ আছে। সুতরাং আমাদের

দেহের মধ্যে সর্ব্বদাই অস্ফুট শব্দ হচ্ছে। সে শব্দের উৎস বা মূল উৎপত্তি স্থান কোথায়? হৃৎপিণ্ডে অনাহতধ্বনি সর্ব্বদাই ধ্বনিত হচ্ছে, সেই ধ্বনিই শিরায় উপশিরায় স্নায়ুমণ্ডলীকে স্পন্দিত ক'রে তুল্‌ছে,—ঠিক "এসরাজ" যন্ত্রের মত। প্রধান তারে যে সুর বাজে, তাহাই অন্যান্য তারে ছড়িয়ে পড়ে। সংযত মনের সাহায্যে হৃৎপিণ্ডে (অনাহতচক্রে) যে মন্ত্রটী ধ্বনিত হবে, সেই মন্ত্রটী দেহের স্নায়ুমণ্ডলীতে কোটী কোটী রক্তকণিকা মুখে অগণিত স্পন্দনের সৃষ্টি করিবে। সুতরাং একটীবার ইষ্টমন্ত্র যে বোধ বা যে ভাব লইয়া অনাহত চক্রে উত্থিত হবে, সেই বোধ বা সেই ভাব দেহের সর্ব্বত্র কোটী কোটী সংখ্যায় ধ্বনিত হবে।

অঙ্গন্যাস, করন্যাস, মাতৃকান্যাস, বীজন্যাস প্রভৃতি অনেকগুলি ন্যাস আমরা পূজায় বসিয়া করিয়া থাকি; উহাদের কেবল মন্ত্রগুলি বা বর্ণমালাগুলি মুখস্থ করিয়া শরীরের সেই সেই স্থান স্পর্শ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। উহাতে প্রকৃত ফলও কিছু হয় না। ন্যাস অর্থে রক্ষা বুঝায়। অনাহতচক্রে উত্থিত সংযত মনের গতিকে পঞ্চাশটী বর্ণমালায় বিভক্ত শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্ষা করা বা আবদ্ধ করাই ঐসব ন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। মনকে এমন সংযত ক'রে আয়ত্তে আন্‌তে হবে, ঠিক ময়দার নেচির মত, যাহার দ্বারা হৃৎপিণ্ডে উত্থিত যে কোন বর্ণের উচ্চারিত শব্দ, শরীরের স্থান বিশেষের স্নায়ুকে স্পন্দিত ক'রে অনুভব করবার সামর্থ জন্মায়। মনে

কর, তুমি বলিলে,—ইং নমঃ দক্ষিণ-নেত্রে, এই "ইং" শব্দটী তোমার হৃৎপিণ্ডে প্রথমে উত্থিত হল, সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুমণ্ডলীতে ছড়িয়ে পড়ল। তুমি সংযত বায়ুর সাহায্যে স্নায়ুমণ্ডলীর মুখগুলি বন্ধ করিয়া ঐ "ইং" শব্দের স্পন্দনটী কেবলমাত্র দক্ষিণ নেত্রের স্নায়ুমণ্ডলীতে সমাহিত করিলে, এবং এইরূপ ঈং নমঃ, বামনেত্রে ইত্যাদি সর্ব্বত্র। আজ যত ইহা শক্ত ও অসম্ভব মনে হচ্ছে, দীর্ঘদিন অভ্যাসের ফলে, উহা তত সহজ ও সম্ভব মনে হবে।

প্রথমতঃ নিয়মিত জপের দ্বারা এই সব অভ্যাস সুরু করতে হয়। মন্ত্রজপই কলিযুগে গৃহস্থের পক্ষে অভীষ্ট সিদ্ধির একমাত্র উপায় বটে, কিন্তু উহাকে ঠিক ঠিক পথে অভ্যাসের দ্বারা চালিত না কারলে কোন দিনই সুফল পাওয়া যাইবে না, এমনভাবে আসনে বসিতে হইবে, যাহাতে ঘাড় মাথা মেরুদণ্ড শিরা উপশিরাগুলি সক্রিয় অবস্থায় আসে। সুষুম্না নাড়ীটী কোথাও কুঁচকাইয়া না থাকে। মন্ত্রটীর অর্থ বুঝিয়া উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া জপ করিতে হয়। যেমন "হ্রীং" মন্ত্রটীর মোটামুটি অর্থ পাপনাশকারিণী অসীমশক্তি—ইহাই মন্ত্রের অর্থবোধ, বা জ্ঞান, বা গুরু। তারপর চিন্তা করিতে হইবে তাঁকে, যিনি অসীম পাপনাশিকা শক্তির উৎস, অর্থাৎ "মাকে"। অভ্যাসের ফলে মন্ত্রটী উচ্চারণ করিলেই অর্থ টী মনে পড়িবে; অর্থ টি মনে উদিত হইলেই উহার উদ্দেশ্য অর্থাৎ দেবতাকে মনে পড়িবে "হ্রীং।" এই শব্দটির মধ্যে তিনটী শক্তি

আছে। মন্ত্রশক্তি অর্থাৎ সাধক ইহা মনন করিলে ত্রাণ পাইবে, গুরুশক্তি ইহার অর্থবোধ বা জ্ঞান, দেবশক্তি,—ঐ অর্থবোধ যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উদিত হয় তিনি। সকল সম্প্রদায়ের সকল মন্ত্রই এইরূপ শব্দ, অর্থ ও উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত। ঐরূপ তিনটী ভাবকে এক করিয়া সাধক ইষ্টমন্ত্র নিয়মিত জপ করিলে এবং অভ্যাসপটু হইলেই তাঁর ঐ মন্ত্র চৈতন্যময় হইয়া উঠিবে। অচৈতন্য মন্ত্রজপে কোন দিনই অভীষ্টলাভ হয় না। এইরূপ চৈতন্যমন্ত্র জপ করিতে করিতে, সাধকের মনে ঐ মন্ত্রের সহিত একটা গাঢ় অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা জন্মায়। এইভাবে অভ্যাসের ফলে গুরুদত্ত মন্ত্রটীর সঙ্গে আত্মীয়তা জন্মালেই সাধক একটা অনুভূতির আস্বাদ পাইয়া থাকে। তখন ঐ ইষ্টমন্ত্রের অনুভূতির একটী তরঙ্গ সাধকের সমস্ত দেহের রক্তকণিকায় ছুটাছুটি করিতে থাকে। তখন সাধকের নিদ্রিত অবস্থায়ও জপ চলিতে থাকে। এই অবস্থায় সাধক জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে, ভূচরে-খেচরে, সর্ব্বত্রই তার সেই শ্রীগুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্রের উচ্চারণ শুনিতে পায়। সে এক অপূর্ব্ব আনন্দময় অবস্থা। প্রথমতঃ কখন কখন ঐ অবস্থা আসে, তারপর ক্রমশঃই ঘন ঘন আসিতে থাকে ; তারপর আমি আর জানি না। পূর্ণজ্যোতিঃ প্রকাশক মহাসাধক এই অবস্থায় সত্যদর্শন করিয়া গাহিয়াছেন—

"মন্ত্রং বা সাধয়িষ্যামি দেহং বা পাতয়াম্যহং।
এবং ভাবং সমাশ্রিত্য জপেন্মন্ত্রং নিরন্তরন্॥

অভ্যাসযোগতো মন্ত্রঃ স্বাভাবিকো ভবিষ্যতি।
স্বপ্নেঽপি যোগিনশ্চিত্তে মন্ত্রধারা প্রবক্ষ্যতি॥
রক্তে চ প্রাণবায়ৌ চ মন্ত্রো নর্ত্তিষ্যতি ধ্রুবং।
মন্ত্রময়া ভবিষ্যন্তি দেহস্থাঃ পরমাণবঃ॥
সদা গাস্যতি তন্মন্ত্রং সিন্ধুঃ সাগরগামিনী।
কীর্ত্তয়িষ্যতি তন্মন্ত্রং কাদম্বানাং কলধ্বনিঃ॥
কুজিষ্যন্তি মহামন্ত্রং বিহগা ব্যোমচারিণঃ।
ঘোষয়িষ্যন্তি তন্মন্ত্রং জগৎপ্রাণাঃ সমীরণাঃ॥
কীর্ত্তয়িষ্যতি তন্মন্ত্রং প্রকৃতির্বিশ্বমাতৃকা।
জগন্ময়ো ভবেন্মন্ত্রো ভবেন্মন্ত্রময়ং জগৎ॥"

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরের পতন এইরূপ সঙ্কল্প লইয়া সর্ব্বদা গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ আরম্ভ করা উচিত, পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা মন্ত্র স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া যায়। নিদ্রিত অবস্থায় সাধকের চিত্তে মন্ত্রজপ চলিতে থাকে। রক্তকণিকার ও প্রাণবায়ুতে ঐ অভ্যস্ত মন্ত্রগুলি নাচিতে থাকে, দেহের পরমাণুগুলি মন্ত্রময় হইয়া উঠে। তখন সাধক শুনিতে পায়, সাগরগামিনী নদীগুলি তাহারই ইষ্টমন্ত্র গাহিতে গাহিতে ছুটিতেছে, সরোবরে হংসশ্রেণী অব্যক্ত মধুরস্বরে তাহারই অভ্যস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে; পাখীগুলি তাহারই মন্ত্র গাহিতে গাহিতে আকাশ পানে উড়িয়া বেড়াইতেছে, জগতের প্রাণস্বরূপ বায়ুপ্রবাহে তাহারই ইষ্টমন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে, বিশ্বজননী প্রকৃতিদেবী সর্ব্বত্র তাহারই ইষ্টমন্ত্র কীর্ত্তন

করিতেছেন। এইরূপে সাধক অনুভব করেন—তাঁরই সেই বহু আরাধিত পরম আত্মীয় মন্ত্রটী যাহা একদিন শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া তাঁর কাণের ভিতর দিয়া অন্তরে প্রবেশ করাইয়াছিলেন, আজ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে—যেখানে জগৎ সেইখানেই তাঁর মন্ত্র, যেখানে তাঁর মন্ত্র সেইখানেই জগৎ, যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। গৃহস্থ! এই আনন্দময় অবস্থা লাভ করবার জন্য মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করে প্রস্তুত হও তোমাকে বহুদূর যেতে হবে, এদিকে সময়ও আর বেশী নাই। তোমার কোন ভয় নাই,—তোমাকে স্ত্রীপুত্র বিষয় বৈভব কিছুই ত্যাগ করতে হবে না, তুমি জীবন্মুক্ত হবে। ওগো গৃহস্থ, কতকগুলি বড় বড় কথা মুখস্থ করিলেই তাঁকে পাবে না, তাঁকে পেতে হলে নিয়মানুবর্ত্তিতা চাই। সত্যের অনুসরণ কর, চরম আদর্শ ফুটিয়ে তুলে দেখিয়ে দাও—ওগো, গৃহস্থ আশ্রমের মত এমন নিরাপদ নিত্যযৌগিক আশ্রম আর দ্বিতীয় নাই।

সংক্ষিপ্ত নিত্যকর্ম্ম।

বর্ত্তমানে জীবনধারণোপযোগী তুটী আহার্য্য যোগাড় কর্‌তেই অনেকের অনেক সময় কেটে যায়। সেইসব কর্ম্মবহুল জীবের জন্যই এই সংক্ষিপ্ত নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি। যাঁদের যথেষ্ট সময় থাকে বা যথেষ্ট অনুরাগ আছে তাঁরা নিজ নিজ শ্রীগুরুদেবের নিকট বিস্তৃত নিত্যকর্ম্ম জানিয়া লইবেন।

সংক্ষিপ্ত নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান কর্‌তে হলেও কতকগুলি মোটামুটি বিষয় জানিয়া লইতে হইবে, এবং বিশুদ্ধ মুখস্থ করিবে। নিম্নে তাহা দেওয়া হইল। সংস্কৃতভাষায় সাধন-পদ্ধতি লেখা আছে, যথাসম্ভব উহার অনুবাদও দেওয়া হইল। ভাবের উৎপত্তি না হলে কেবল শাব্দিক উচ্চারণে সত্বর তেমন ফলোদয় হয় না। মন্ত্রগুলির আরম্ভের পূর্ব্বে যেখানে নমঃ দেওয়া আছে, উহার পরিবর্ত্তে উপবীতধারিগণ ওম্ বসাইয়া লইয়া উচ্চারণ করিবেন—শ্রীগুরুদেব, স্বয়ং মন্ত্রদাতা গুরু তাঁর যোগ্য পুত্র, পৌত্র।

"গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু গুরুবৎ তৎসুতাদিষু"।

ইষ্টদেবতা,—দীক্ষাদানকালে শ্রীগুরুদেব যে দেবমূর্ত্তি নিজ শক্তিবলে শিষ্যকে দেখাইয়া দেন, সেই মূর্ত্তিই শিষ্যের ইষ্টদেব মূর্ত্তি। ইষ্টমন্ত্র বা মূলমন্ত্র বীজমন্ত্র—যে মন্ত্রটী, শ্রীগুরুদেব, দীক্ষাদানকালে শিষ্যের কানের ভিতর দিয়া প্রাণে পৌঁছাইয়া দেন।

জলশুদ্ধি,—নমো গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।

অখণ্ড ভারতের গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীগণ আমার কোষার জলে উপস্থিত হউন বলিয়া চিন্তা করিতে হয়।

গণেশাদিপঞ্চদেবপূজা—গণেশাদিপঞ্চদেবতাভ্যঃ নমঃ, ইন্দ্রাদিদশদিক্পালেভ্যঃ নমঃ, আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যঃ নমঃ সর্ব্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ নমঃ সর্ব্বাভ্যঃ দেবীভ্যঃ নমঃ।

আসনশুদ্ধি,—স্বীয় দক্ষিণভাগে আসনের নিম্নে ত্রিলোক-মণ্ডল স্থাপিত করিয়া হ্রীঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ বলিয়া একটী পুষ্প দিবে পরে আসন ধরিয়া—মেরুপৃষ্ঠ-ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। নমঃ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয়সি মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥

হে ধরিত্রি! তোমাকর্ত্তৃক সমস্ত লোক ধৃত হইয়াছে। তোমাকে বিষ্ণু অর্থাৎ সূর্য্য ধারণ করিয়া আছেন, তুমি আমাকে সর্ব্বদা ধারণ করিতেছ, এই আসন তুমি পবিত্র কর।

ধেনুমুদ্রা—করযোড় করিয়া বাম করাঙ্গুলির ফাঁক চারিটীর ভিতর দিয়া দক্ষিণ তর্জ্জন্যাদি অঙ্গুলি চারিটী প্রবেশ করাইবে, পরে, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী বাম হস্তের মধ্যমাতে আবার বাম তর্জ্জনী দক্ষিণ মধ্যমাতে যোগ করিবে, তৎপরে বাম কনিষ্ঠাঙ্গুলি দক্ষিণ অনামিকা অঙ্গুলিতে ও দক্ষিণ কনিষ্ঠা

বাম অনামাতে যোগ করিবে—হাতের এইরূপ অবস্থাকে ধেনুমুদ্রা কহে।

অঙ্কুশমুদ্রা :—দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি হইতে তর্জ্জনী অঙ্গুলীতে একটু বক্রভাবে অঙ্কুশের মত বাহির করিয়া দিবে। এই মুদ্রাটীও জলশুদ্ধিতে প্রয়োজন।

কূর্ম্মমুদ্রা :—চিতভাবে অবস্থিত বাম করতলের অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনী-মূলে অধোমুখ দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকাঙ্গুলী সংযোগ করিবে ; পরে দক্ষিণ তর্জ্জন্যগ্রভাগ দ্বারা বামাঙ্গুষ্ঠাগ্র-ভাগ সংযোগ করিবে এবং দক্ষিণ কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে বাম তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংযোগ করিবে, বাম মধ্যমা ও অনামিকা দক্ষিণ করের কনিষ্ঠামূলে সংযোগ করিবে। এই কূর্ম্মমুদ্রার মধ্যে একটী পুষ্প রাখিয়া দেবতার ধ্যান করিতে হয়।

তত্ত্বমুদ্রা :—অধোমুখ দক্ষিণ করের অনামিকার অগ্রভাগে কেবল অঙ্গুষ্ঠসংযোগ করিবে।

প্রণায়াম্ :—পূরক অর্থাৎ শ্বাসবায়ুকে আকর্ষণ, কুম্ভক অর্থাৎ সেই বায়ুকে রুদ্ধ করিয়া রাখা, রেচক অর্থাৎ সেই রুদ্ধ বায়ুকে অতি ধীরে ধীরে ত্যাগ করা।

মনেকর—তুমি সুখাসনে সরলভাবে মেরুদণ্ড ঠিক সমান রাখিয়া বসিয়াছ—দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তোমার দক্ষিণ নাসাপুট বেশ চাপিয়া ধরিয়া বাম নাসা দিয়া আটবার তোমার ইষ্টমন্ত্র মনে মনে জপ করিতে করিতে বায়ু টানিয়া লইবে, বায়ু টানা হইলেই অঙ্গুষ্ঠ যেমনভাবে দক্ষিণ নাসাপুটে চাপা আছে, সেই-

ভাবে রাখিয়াই, বাম নাসাপুটকে দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়া বেশ টিপিয়া ধরিবে; যাহাতে রুদ্ধ বায়ু নাসাপুট দিয়া বাহির হইয়া না যায় লক্ষ্য রাখিয়া ৩২ বার ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া লইবে। ঐ ৩২ বার জপ শেষ হইলেই দক্ষিণ নাসাপুট হইতে অঙ্গুষ্ঠ সরাইয়া লইবে ও ১৬ বার ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে রুদ্ধ বায়ুটী ত্যাগ করিবে। পুনরায় সঙ্গে সঙ্গে ঐ দক্ষিণ নাসাপুট দিয়াই ৮ বার ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে বায়ু আকর্ষণ করিয়া লইবে, তখন কিন্তু বাম নাসাপুট চাপাই আছে। এইভাবে বায়ু আকর্ষণ হইলেই ঐ বায়ুকে পূর্ব্বের মত রোধ করিয়া ৩২ বার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। ৩২ বার জপ শেষ হইলেই, বাম ন্যসাপুট খুলিয়া দিবে, এবং ধীরে ধীরে ১৬ বার ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে বায়ুত্যাগ করিবে, তখন কিন্তু দক্ষিণ নাসাপুট অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপা থাকিবে, বাম নাসাপুট দিয়া বায়ুত্যাগ শেষ হইলেই পুনরায় ঐ বাম নাসাপুট দিয়া ৮ বার ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে বায়ু আকর্ষণ করিয়া লইবে। এবং পুনরায় অনামিকা ও কনিষ্ঠার দ্বারা বাম নাসাপুট চাপিয়া ধরিয়া পূর্ব্ববৎ বায়ুকে রোধ করিবে এবং ৩২ বার জপ করিবে। ৩২ বার জপ শেষ হইলেই দক্ষিণ নাসাপুট খুলিয়া দিবে, এবং ১৬ বার জপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে তাহা ত্যাগ করিবে। ইহাই সংক্ষিপ্ত প্রাণায়াম্। ইহাতে স্বাস্থ্যহানি ঘটে না, প্রত্যেক দীক্ষিত ব্যক্তির ইহা অবশ্যকরণীয়।

উপবীতধারীদের বিষ্ণুপূজার জন্যই নিম্নলিখিত করন্যাস ও অঙ্গন্যাস দেখান হইতেছে।

করন্যাস ঃ—"আং" অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ বলিয়া উভয় হস্তের তর্জ্জনীর দ্বারা স্ব স্ব জাতীয় অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে। "ঈং" তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, বলিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় হস্তের তর্জ্জনী স্পর্শ করিবে, "ঊং" মধ্যমাভ্যাং বষট্ বলিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় হস্তের মধ্যমা অঙ্গুলি স্পর্শ করিবে, "ঐং" অনামিকাভ্যাং "হূং" বলিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় হস্তের অনামিকা স্পর্শ করিবে, "ঔং" কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট বলিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি স্পর্শ করিবে, "অঃ" করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় "ফট্" বলিয়া বাম করতলে দক্ষিণ করের অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করিবে।

অঙ্গন্যাস ঃ—আং হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকার দ্বারা নিজ বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবে, "ঈং" শিরসে স্বাহা বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগ দিয়া নিজ শিরঃ স্পর্শ করিবে, "ঊং' শিখায়ৈ বষট বলিয়া অঙ্গুষ্ঠার অগ্রভাগ দ্বারা কেশগুচ্ছ স্পর্শ করিবে, "ঐং" কবচায় "হূং" বলিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুলিগুলি দ্বারা বিপরীত ক্রমে উভয় বাহু স্পর্শ করিবে, "ঔং" নেত্রাভ্যাং বৌষট্ বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকার দ্বারা নিজ দুই চক্ষুর পাতা ও নাসিকামূল স্পর্শ করিবে, "অঃ" করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্, অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির দ্বারা বাম করতল স্পর্শ করিবে।

উক্ত করন্যাস ও অঙ্গন্যাসে লিখিত মন্ত্রগুলির শেষে স্বাহা বষট্ ও বৌষট্ এই শব্দগুলির পরিবর্ত্তে সর্ব্ববর্ণের স্ত্রীজাতি ও শূদ্রেরা নমঃ-শব্দটী বসাইয়া লইবেন। **স্ত্রী ও শূদ্রজাতির পক্ষে**:—যাঁহাদের ইষ্টমন্ত্র "হ্রীং" তাঁহারা "হ্রাং' হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া হৃদয়, "হ্রীং" শিরসে নমঃ বলিয়া মস্তক "হ্রূং" শিখায়ৈ নমঃ বলিয়া কেশগুচ্ছ, "হ্রৈং" কবচায় নমঃ বলিয়া উভয় বাহু "হ্রৌং" নেত্রত্রয়ায় নমঃ বলিয়া উভয় নেত্র ও ভ্রূমধ্যস্থল স্পর্শ করিবে। "হ্রঃ" করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় "ফট্" বলিয়া বাম করতলে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা আঘাত করিবে। যে স্থলে যে অঙ্গুলি দ্বারা করন্যাসে স্পর্শ করিবার কথা বলা হইয়াছে সর্ব্বত্র সেই নিয়ম রক্ষা করিয়া স্থানগুলি স্পর্শ করিতে হইবে। "হ্রীং" মন্ত্রের করন্যাসও ঠিক অঙ্গন্যাসের অনুরূপ। যথা—"হ্রাং" অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ "হ্রীং" তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ, "হ্রূং" মধ্যমাভ্যাং নমঃ "হ্রৈম" অনামিকাভ্যাং নমঃ, "হ্রৌং" কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ "হ্রঃ" করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় "ফট্" বলিয়া স্ব স্ব স্থান স্পর্শ করিবে।

কেবল উপবীতধারীগণ স্মরণ রাখিবেন:—বিষ্ণুমন্ত্রের করন্যাসে ও অঙ্গন্যাসে যেখানে যেখানে স্বাহা, বষট্ ও বৌষট্ বলা হইয়াছে, সর্ব্বত্র নমঃ শব্দের পরিবর্ত্তে ঐ শব্দগুলি ঠিক ঠিক বসাইয়া লইবেন। যাঁহাদের ইষ্টমন্ত্র "ক্লীং" তাঁহারা 'ক্লাম্" অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, "ক্লীং" তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ 'ক্লূং'মধ্যমাভ্যাং নমঃ "ক্লৈম্" অনানিকাভ্যাং নমঃ "ক্লৌং" কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ,

"ক্লঃ" করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া করন্যাস করিবেন। "ক্লাং" হৃদয়ায় নমঃ, "ক্লীং" শিরসে নমঃ "ক্লূং" শিখায়ৈ নমঃ, "ক্লৈং" কবচায় নমঃ "ক্লৌং" নেত্রত্রয়ায় নমঃ, "ক্লঃ" করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া পূর্ব্বলিখিত স্ব স্ব স্থান স্পর্শ করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে। যাঁদের "দূঃ" তাঁহারা "দাম্" অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ "দীং" তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ, "দূং" মধ্যমাভ্যাং নমঃ "দৈম্" অনামিকাভ্যাং নমঃ "দৌং" কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, "দঃ" করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ এই বলিয়া স্ব স্ব অঙ্গুলিতে পূর্ব্বের মত স্পর্শ করিয়া করন্যাস করিবে। ঐরূপ অঙ্গন্যাসও করিবে যথা—"দাং" হৃদয়ায় নমঃ, "দীং" শিরসে নমঃ, "দূং" শিখায়ৈ নমঃ, "দৈং" কবচায় নমঃ, "দৌং" নেত্রত্রয়ায় নমঃ, "দঃ" করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় "ফট্" বলিয়া স্ব স্ব স্থান স্পর্শ করিবে।

বিভিন্ন দেবদেবীর গায়ত্রী নিম্নে দেওয়া হইল :—

যে দেবতাটী যাঁর ইষ্টদেবতা মাত্র সেই দেবতার গায়ত্রীটী মুখস্থ করিয়া লইবেন। উপবীতধারীগণ গায়ত্রীর পূর্ব্বে "ওঁম্" শব্দ উচ্চারণ করিবেন, স্ত্রীজাতি ও শূদ্রেরা গায়ত্রীর পূর্ব্বে ওঁ নমঃ যোগ করিয়া লইবেন।

দক্ষিণকালিকা—কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ। ইহার অর্থ—শ্রীগুরুদেবের উপদেশে আমি কালীমাতাকে জানিয়াছি, শ্মশানবাসিনী মাকে অর্থাৎ

সাম্যবোধদায়িনী দেবীকে আমি ধ্যান করি, সেই সামবোধরূপা আমার ধ্যানরূপা মাতা আমাকে বিপৎসঙ্কুল পথ হইতে সুপথে প্রেরণ করুন।

জগদ্ধাত্রী দুর্গা—দুর্গায়ৈ বিদ্মহে চিৎস্বরূপায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। শ্রীগুরুর উপদেশে দুর্গাকে জানিয়াছি, চিৎস্বরূপা অর্থাৎ চৈতন্যময়ী মাকে আমি ধ্যান করি; সেই সেই জ্ঞানরূপা ধ্যানরূপা দুর্গাদেবী আমাকে সৎপথে প্রেরণ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ—কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। শ্রীগুরুর কৃপায় কৃষ্ণকে জানিয়াছি, দামোদরকে অর্থাৎ বিশ্বমণ্ডল যাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, তাঁহাকে ধ্যান করিতেছি সেই বিশ্বগঠনকারী আমার ধ্যানরূপ সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু আমাকে সুপথে প্রেরণ করুন।

দুর্গা—মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি, তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।

অন্নপূর্ণা—ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি, তন্নোঽন্নপূর্ণা প্রচোদয়াৎ।

শিব—তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

রাম—দাশরথয়ে বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।

বিষ্ণু—ত্রৈলোক্যরক্ষকায় বিদ্মহে স্মরগুরবে ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

সূর্য্য—আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি, তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।

তারা—তারায়ৈ বিদ্মহে মহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা—প্রত্যেক দীক্ষিত সর্ব্বজাতীয় নরনারীর এই তান্ত্রিক-সন্ধ্যা প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহা অভ্যাস করিতে পারিলে, অতি সহজসাধ্য।

প্রথমেই আসনে বসিয়া কোষার জল তিনবার উপবীত-ধারীরা পান করিবেন, স্ত্রী ও শূদ্রজাতি, নিজ নিজ ওষ্ঠদ্বয়ে তিনবার ছিটা দিবেন। ইহার নাম আচমন। সর্ব্বত্র পূজাদি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই আচমন করিতে হয়। তিনবার জল পানের তিনটি মন্ত্র ; যথা—ওঁম্ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁম্ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁম্ শিবতত্ত্বায় স্বাহা। স্ত্রী ও শূদ্রেরা ওঁ "স্বাহা" এই শব্দগুলির পরিবর্ত্তে নমঃ শব্দ ব্যবহার করিবেন। ঐ মন্ত্র তিনটীর অর্থ জানা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আত্মতত্ত্বায় স্বাহা অর্থাৎ আমার জীবাত্মা তাঁহাকে এই জল আহুতি দিতেছি। বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানকে এই জল আহুতিরূপে দিতেছি, শিবতত্ত্বায় স্বাহা অর্থাৎ পরব্রহ্মকে এই জল আহুতিরূপে দিতেছি। ইহার মর্ম্মার্থ,—আমার জীবাত্মা ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া নিত্যানন্দ-ব্রহ্মে উপস্থিত হউন।

আচমনের পর কোষারজলে অঙ্কুশমুদ্রা দেখাইয়া জলশুদ্ধির মন্ত্র "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি পাঠ করিবে, এবং ধেনুমুদ্রা জলের উপর দেখাইবে। পরে নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তত্ত্বমুদ্রার দ্বারা ঐ জল তিনবার মাটীতে এবং সাতবার মস্তকে ছিটা দিবে, তারপর নিজ ইষ্টমন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে, করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। তারপর বামকরতলে খানিকটা জল লইয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা ঢাকা দিবে এবং "হং 'যং' 'বং' লং' য়ং" এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিবে। পরে বাম হাতের অঙ্গুলিগুলি একটু ফাঁক করিয়া প্রতিবার ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সাতবার মস্তকে দিবে। অবশিষ্ট যে জলটুকু বামহাতে রহিল, তাহা ডানহাতে লইয়া আঘ্রাণ করিয়া ঐ জলকে দেহস্থ পাপ মনে করিয়া খাট্ বলিয়া মাটীতে ছুড়িয়া ফেলিবে। ইহার নাম সন্ধ্যার অঘমর্ষণ। অঘশব্দে পাপ বুঝায়।

পুনরায় পূর্ব্বোক্ত আচমণ মন্ত্রে আচমন করিয়া লইবে। এবং নিজ নিজ ইষ্টদেবতার' গায়ত্রী তিনবার পাঠ করিবে। তারপর নিজ কিজ ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিজ ইষ্টদেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া তর্পণ করিবে। যথা—যাঁর ইষ্টদেবতা কালী তিনি হ্রীং দক্ষিণকালিকাং তর্পয়ামি বলিয়া তাম্রপাত্রে জল দিবে। এইরূপ তিনবার দিবে। সর্ব্বত্র এইরূপ। যাঁর ইষ্টদেবতা কৃষ্ণ তিনি ক্লীং কৃষ্ণং তর্পয়ামি বলিয়া তর্পণ করিবেন। এইরূপ যাঁর যা ইষ্টদেবতা উক্ত

অনুকরণে করিবেন। [স্মরণ রাখিতে হইবে, পিপাসিত কণ্ঠে একগণ্ডুষ শীতল জল পাইলে তোমার যেমন তৃপ্তি হয় তোমার প্রদত্ত তর্পণের জল দেবতা পান করিয়া তাঁর ঠিক সেইরূপ তৃপ্তি হইতেছে ইহা অনুভব করিতে হইবে]।

উপবীতধারীগণ—"ওঁ হ্রীঁং হংসমার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তি সহিতায় ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ"—এই মন্ত্রে সূর্য্যকে ত্রিসন্ধ্যায় অর্ঘ্য (অভাবে জল) দিবে।

স্ত্রীশূদ্রজাতিরা—"নমো ঘৃণিসূর্য্য আদিত্য ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।" এই বলিয়া ত্রিসন্ধ্যায় সূর্য্যকে অর্ঘ্য (অভাবে জল) দিবে।

তারপর ইষ্টদেবীকে অর্ঘ্য (অভাবে জল) দিবে। যথা— নিজ নিজ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইদমর্ঘ্যং (মূলমন্ত্র) সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থায়ৈ অমুক (দক্ষিণকালিকা, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি নাম উল্লেখ করিবে) দেবতায়ৈ নমঃ। তারপর গায়ত্রীর ধ্যান করিবে।

প্রাতঃগায়ত্রী ধ্যান ঃ—

উদ্যদাদিত্যসংকাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে॥

নক্ষত্রযুক্ত আকাশে উদীয়মান বালসূর্য্যের কিরণের মত যিনি তেজঃসম্পন্না, যিনি পুস্তক (বেদগ্রন্থ) রুদ্রাক্ষমালাধারিণী, কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্মপরিধানা এমন ব্রাহ্মী মূর্ত্তিকে ধ্যান করিবে। এই ধ্যানের পর নিজ নিজ ইষ্টদেবতার গায়ত্রী দশবার জপ করিবে। এবং জপ সমর্পণ করিবে।

জপসমর্পণের মন্ত্র :—(স্ত্রীদেবতা হইলে) নমঃ গুহ্যাতিগুহ্য-গোপ্‌ত্রি ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্‌। সিদ্ধি র্ভবতু মে দেবি. ত্বৎপ্রসাদাৎ, মহেশ্বরি॥ এই বলিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে হাতে একটু জল দিবে।

পুরুষদেবতা হইলে এই মন্ত্রে জল সমর্পন করিবে—নমঃ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তঃ! ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্‌। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ, সুরেশ্বর॥ তারপর ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবে। ইতি সংক্ষিপ্ত প্রাতঃসন্ধ্যা।

মধ্যাহ্নসন্ধ্যা :—আচমন হইতে অর্ঘ্যদানপর্য্যন্ত প্রাতঃ-সন্ধ্যার মত করিয়া লইবে। তারপর মধ্যাহ্নগায়ত্রীর ধ্যান পড়িবে। দশবার গায়ত্রী জপ করিবে এবং জল সমর্পণের মন্ত্র পড়িয়া জপ সমর্পণ করিবে।

মধ্যাহ্ন গায়ত্রীধ্যান :—

শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাং।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্‌॥

শ্যামবর্ণা দেবী, শঙ্খচক্রগদাপদ্ম চতুর্ব্বাহুতে ধারণ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলরূপ আসনে বসিয়া আছেন, এমন যে বৈষ্ণবী মূর্ত্তি. তাঁহাকে ধ্যান করিবে। এই মধ্যহ্নসন্ধ্যা প্রাতঃকালে প্রাতঃ-সন্ধ্যায় সাঙ্গ করিতে পারা যায়।

সায়ংসন্ধ্যা :—আচমন হইতে অর্ঘ্যদান পর্য্যন্ত প্রাতঃসন্ধ্যার মত করিয়া লইবে। তারপর সায়াহ্নগায়ত্রীর ধ্যান পড়িবে।

দশবার গায়ত্রী জপ করিবে। জপ সমর্পণ-মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিবে।

সায়াহ্ন-গায়ত্রী-ধ্যান :—

সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্ যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্॥
ত্রিনয়নাং বরদাং পাশ-শূল-নৃকরোটিকাং।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়েদ্দেবীং সমভ্যসেঃ॥

বৃষাসনে উপবিষ্টা, শুক্লবর্ণা এবং শ্বেতাম্বরা দেবী শূল-পাশাস্ত্রধারিণী, যাঁর হস্তে নরমুণ্ডের খুলি, যিনি সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে অবস্থান কর্‌ছেন, এমন শিবারূপিণী বরদায়িনী গায়ত্রীদেবীকে পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিবে।

শ্রীগুরুপূজা :—প্রত্যেক দীক্ষিত ব্যক্তি নিজ নিজ পূজার গৃহে শ্রীগুরুদেবের ফটো রাখিবেন। গুরুপূজা না করিয়া ইষ্টদেব পূজা করিলে উহা ব্যর্থ হইবে। সংক্ষিপ্ত গুরুপূজা নিম্নে প্রদত্ত হইল। সকাল সন্ধ্যায় প্রত্যহ শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে ধূপ দীপ পুষ্প চন্দন এবং মাল্য দান করিবেন। একমাত্র গুরুপূজার দ্বারা সর্ব্বপূজার ত্রুটীর মার্জ্জনা হয়। আসনে বসিয়া আচমনমন্ত্রে আচমন করিয়া লইবেন। কূর্ম্মমুদ্রায় হস্তে পুষ্প কিংবা একটু জল লইয়া শ্রীগুরুদেবের ধ্যান পাঠ করিবেন

শ্রীগুরুর ধ্যান :—

নমো বরাভয়করং শান্তং শুক্লবর্ণং সিতাম্বরং।
জ্ঞানানন্দময়ং সাক্ষাৎ শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপিণম্॥

এই ধ্যান বলিয়া হাতের জল বা পুষ্প নিজ মস্তকে দিবে এবং মনে মনে শ্রীগুরুদেবকে ইচ্ছামত পূজা করিবে। তারপর পুনরায় ধ্যান পাঠ করিবে। পরে হস্তস্থিত জল বা পুষ্প শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে তাম্রপাত্রে ফেলিবে পরে একটু জল লইয়া এতৎপাদ্যং ঐং শ্রীগুরুবে নমঃ বলিয়া জল তাম্রপাত্রে ফেলিয়া দিবে। পুষ্প বা জল লইয়া এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ঐং শ্রীগুরুবে নমঃ বলিয়া তাম্রপাত্রে ফেলিয়া দিবে। স্ত্রী ও শূদ্রজাতি ওং না বলিয়া ঔং বলিবে। ঐং (স্ত্রী ও শূদ্র) ঔং শ্রীগুরবে নমঃ বলিয়া এই গুরুমন্ত্র অন্ততঃ দশবার জপ করিবে। জপ সমর্পণমন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। সমর্থ হইলে কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া শ্রীগুরুদেবের আরত্রিক করিবে। পরে নিম্নলিখিত শ্রীগুর্ব্বষ্টক ও শ্রীগুরুকবচ অবশ্য অবশ্য প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় পাঠ করিবে।

শ্রীগুর্ব্বষ্টকম্।

মন্ত্রঃ সত্যং পূজা সত্যং সত্যং দেবো নিরঞ্জনঃ।
গুরোর্বাক্যং সদা সত্যং সত্যমেব পরং পদম্॥
ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃপদং।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং সিদ্ধিমূলং গুরোঃকৃপা॥
মাতাপিতৃসুহৃদ্বন্ধু-বিদ্যাতীর্থানি দেবতা।
ন তুল্যং গুরুণা শীঘ্রং স্পৃশন্তি পরমংপদম্॥

ন গুরোরধিকং শাস্ত্রং ন গুরোরধিকং তপঃ।
ন গুরোরধিকো মন্ত্রো ন গুরোধিকং ফলম্॥
গুরুস্তীর্থং গুরুর্যজ্ঞো গুরুর্দ্দানং গুরুস্তপঃ।
গুরুরগ্নি র্গুরুঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বং গুরুময়ং জগৎ॥
কিং দানেন কিং তপসা, কিমন্যতীর্থসেবয়া।
শ্রীগুরোরর্চ্চিতৌ যেন পাদৌ তেনার্চ্চিতং জগৎ॥
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।
গুরোঃ পাদতলে তানি নিবসন্তি হি সন্ততম্॥
গুরুঃ কর্ত্তা গুরুর্হর্ত্তা গুরুঃ পাতা মহীতলে।
গুরুসন্তোষমাত্রেণ তুষ্টাঃ স্যুঃসর্ব্বদেবতাঃ।
ইতি প্রাণতোষিণীগ্রন্থকৃতগুর্ব্বষ্টকম্ সমাপ্তম্॥

শ্রীগুরুকবচম্।

দেব্যুবাচ,—ভূতনাথ মহাদেব কবচং তস্য মে বদ।
গুরুদেবস্য দেবেশ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণঃ॥
ঈশ্বর উবাচ,—অথাতঃ কথয়ামীশে কবচং মোক্ষদায়কম্।
যস্যজ্ঞানং বিনা দেবি ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ॥
ব্রহ্মোদয়োঽপি গিরিজে সর্ব্বত্র যাজিনঃ স্মৃতাঃ।
অস্য প্রসাদাৎ সকলা বেদাগমপুরঃসরাঃ॥
কবচস্যাস্য দেবেশি ঋষির্বিষ্ণুরুদাহৃতঃ।
ছন্দোবিরাড়্ দেবতা গুরুদেবঃ স্বয়ং শিবঃ॥

চতুর্ব্বর্গো জ্ঞানমার্গে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
সহস্রারে মহাপদ্মে কর্পূরধবলো গুরুঃ ॥
বামোরুস্থিতশক্তির্যঃ সর্ব্বত্র পরিরক্ষতু ।
পরমাখ্যো গুরুঃপাতু শিরসং মম বল্লভে ॥
পরপরাখ্যো নাসাং মে পরমেষ্ঠী মুখং সদা ।
কণ্ঠং মম সদাপাতু প্রহ্লাদানন্দনায়কঃ ॥
বাহু দ্বৌ সনকানন্দঃ কুমারানন্দ এব চ ।
বশিষ্ঠানন্দনাথশ্চ হৃদয়ং পাতু সর্ব্বদা ॥
ক্রোধানন্দঃ কটিং পাতু সুখানন্দঃ পদং মম ।
ধ্যানানন্দশ্চ সর্ব্বাঙ্গং বোধানন্দশ্চ কাননে ।
সর্ব্বত্র গুরবঃ পান্তু সর্ব্বে ঈশ্বররূপিণঃ ॥
ইতি তে কথিতং ভদ্রে কবচ পরমং শিবে ।
ভক্তিহীনে দুরাচারে দত্ত্বেদং মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥
অস্যৈব পঠনাদ্দেবি ধারণাৎ শ্রবণাৎ প্রিয়ে ।
জায়তে মন্ত্রসিদ্ধিশ্চ কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ শিখায়াং বীরবন্দিতে ।
ধারণান্নাশয়েৎ পাপং গঙ্গয়াঃ কল্মষং যথা ॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যদি মন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে ।
তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং কৃত্বা গুরুর্যাতি সুনিশ্চিতম্ ॥
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন ।
ইতি কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে গুরুকবচং সমাপ্তম্ ॥

শ্রীগুরুপূজা করিতে যদি কেহ একান্তই অসমর্থ হয়েন, তিনি শ্রীগুর্ব্বষ্টক ও শ্রীগুরুকবচ অবশ্যই পাঠ করিতে ভুলিবেন না, ইহাতেও অনেকটা কাজ হবে।

শিবপূজা।

শ্রীগুরুদেবের পূজার পরই ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হয়। একটী পুরুষ দেবতার সংক্ষিপ্ত পূজা নিম্নে দেখান হইল।

আসনে বসিয়া প্রথমেই পূর্ব্বের মত আচমন করিয়া লও। জলশুদ্ধি ও আসনশুদ্ধি করিয়া লও। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিজ বামদিকে প্রণাম করিয়া বলিবে—নমো গুরুভ্যো নমঃ পরমগুরুভ্যোঃ নমঃ, পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ, ডান দিকে প্রণাম করিয়া বলিবে—নমো গণেশায় নমঃ, মধ্যস্থলে প্রণাম করিয়া বলিবে—নমঃ হৌং শিবায় নমঃ (এইখানে যার যাঁহা ইষ্টদেবতা, তাঁহার নাম করিবে—যথা ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ, হ্রীং দক্ষিণ-কালিকায়ৈ নমঃ, দুং জগদ্ধাত্র্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ ইত্যাদি) হৌং মন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে, ঐং মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিবে বা স্মরণ করিবে। একটী শ্বেতপুষ্প বা একটু জল কূর্ম্মমুদ্রায় গ্রহণ করিয়া শিবের ধ্যান করিবে।

শিবের ধ্যান।

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং,
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং।

পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানাং,
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।

ধ্যানের অর্থ :—সর্ব্বদা শিবকে চিন্তা করিবে যিনি রজতপর্ব্বতের ন্যায় বিশালদেহ বিশিষ্ট, রত্নময়ভূষণে যাঁহার দেহটী উজ্জ্বল হয়েছে—যাঁহার ললাট চন্দ্রকলায় বিভূষিত, যাঁহার বামহস্তে পরশু (অস্ত্রবিশেষ) ও মৃগমুদ্রা (বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মধ্যমা ও অনামিকা চাপিয়া ধরিয়া তর্জ্জনী ও কনিষ্ঠাকে সরল উচ্চভাবে রাখিলে মৃগমুদ্রা হয়), দক্ষিণ হস্তে বর ও অভয়মুদ্রা, যাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, যিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, যাঁহার চতুর্দ্দিকে দেবগণ স্তুতি করিতেছেন, যিনি বিশ্বের আদি ও মূল কারণ, সমুদয়ভয়-নাশক, যিনি পঞ্চবদন এবং প্রত্যেক বদনে যাঁর তিনটী করিয়া চক্ষু আছে।

এইরূপ ধ্যান করিয়া সাধক নিজ মস্তকে ফুল বা জল দিবে। এবং মনে মনে ইচ্ছামত যত কিছু উপচার ভাল লাগে, তাই দিয়া পূজা করিবে। পুনরায় পূর্ব্বোক্ত ধ্যান করিবে।

পরে হস্তদ্বয় চিৎ করিয়া আবাহন করিবে,—হৌং শিব ইহাগচ্ছাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

পরে দশোপচারে পূজা

১। এতৎ পাদ্যং নম হৌং শিবায় নমঃ। উদ্দেশে একটু জল দিয়া দেবতার চরণদ্বয় মনে মনে ধুইয়া দিবে।

তোমার নিজের পাদুখানি বেশ করে কেহ ধোয়াইয়া দিলে এবং মুছাইয়া দিলে, তোমার যেমন তৃপ্তি হয়, তোমার ঐ পাদ্যপ্রদানে তোমার ইষ্টদেবতা ঐরূপ তৃপ্তিলাভ করিলেন— এইটী অনুভব করিয়া লইবে। আজ ঠিক ঠিক না পার অভ্যাস করিলেই অদূরে সমর্থ হইবে।

২। (আতপচাউল দুর্ব্বা পুষ্প বিল্বপত্র লইয়া) ইদমর্ঘ্যং (যজুর্ব্বেদী ও শূদ্রদিগের এষোহর্ঘ্যঃ) নমঃ হৌং শিবায় নমঃ। দেবতার মস্তকে ঐ অর্ঘ্যদান করিবে।

৩। (একটু জল লইয়া) ইদম্ আচমনীয়োদকং নমঃ হৌং শিবায় নমঃ।

৪। (একটু জল লইয়া) ইদং স্নানীয়োদকং নমঃ হৌং শিবায় নমঃ। দেবতার মস্তকে শীতল জল দিয়া স্নান করাইবে, তোমাকে কেহ যত্নপূর্ব্বক স্নান করাইয়া মুছাইয়া দিলে তোমার যেমন তৃপ্তি হয়, তোমার প্রাণের দেবতার ঠিক সেই তৃপ্তি হইল, যতক্ষণ তুমি ইহা অনুভব না করিতে পারিতেছ ততক্ষণ তোমার দেবতাকে ঠিক স্নানীয় দান করা হইল না। হতাশ হয়ো না, অভ্যাস কর।

৫। (একটু জল লইয়া) ইদং পুনরাচমনীয়োদকং হৌং নমঃ শিবায় নমঃ। জলটুকু দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করিবে। স্নান শেষ করিয়া একটী কুলকুচু করিলে, তুমি যেমন তৃপ্ত হও, তোমার দেবতা ঠিক সেইরূপ তৃপ্ত হইলেন অনুভব কর। এইরূপ সর্ব্বত্র।

৬। চন্দন (শ্বেত বা রক্তচন্দন দিবে—যার যেমন ইষ্টদেবতা) লইয়া এষ গন্ধঃ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া ধীরে ধীরে চন্দন বিলেপন করিবে; ছিটাইবে না, তোমার গাত্রে কেহ চন্দন ছিটাইলে তোমার কি তাহা ভাল লাগে, কিন্তু ধীরে ধীরে কেহ যদি তোমার অঙ্গে চন্দন লেপন করেন, তুমি কতই আনন্দিত হও। তোমার যাতে আনন্দ হয় না ভক্তবৎসল তোমার ইষ্টদেবতাও তাতে আনন্দ পান না।

৭। ইদং সচন্দনং পুষ্পং নমঃ হৌং শিবায় নমঃ। সচন্দন পুষ্প ধীরে অর্পণ করিবে। পুষ্পগুলি ছুড়িয়া মারিবে না।

ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং নমঃ হৌং শিবায় নমঃ, বলিয়া বিল্বপত্রগুলি অতি ধীরে ধীরে প্রদান করিবে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিষ্ণু, শ্রীরাম যাঁদের ইষ্ট দেবতা তাঁরা বিল্বপত্রের পরিবর্ত্তে ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে নমঃ (উপবীতধারী ব্রাহ্মণ—"নমঃ" স্থানে "স্বাহা" বলিবেন) বলিয়া তুলসী দান করিবে।

৮। এষ ধূপঃ নমঃ হৌং শিবায় নমঃ।

৯। এষ দীপঃ নমঃ হৌং শিবায় নমঃ।

১০। ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং নমঃ হৌং শিবায় নমঃ বলিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া নিবেদন করিবে। দশবার নমঃ হৌং শিবায় নমঃ বলিয়া জপ করিবে। মনে মনে চিন্তা করিবে যে সমস্ত দ্রব্যগুলি তুমি নিবেদন করিলে, ঐগুলি তুমি খাইলে তোমার যেরূপ আস্বাদ বোধ হয় ও আনন্দ বোধ হয়, তোমার

দেবতাও ঠিক সেইরূপ হইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তকে আগে না খাওয়াইয়া খান না। ভক্তের তৃপ্তিতে তাঁর তৃপ্তি ভক্তের আনন্দই তাঁর আনন্দ। নতুবা তিনি নিত্যতৃপ্ত, নিত্যানন্দ, তাঁকে আবার আনন্দ ও তৃপ্তিদানের প্রশ্ন আসে না। ভক্তের অতৃপ্তিই পূজার কারণ। ভক্ত নিত্য তৃপ্ত হ'য়ে গেলে, আর পূজা থাকে না। সেদিনই পূজা শেষ হয়, যেদিন পূজারী নিত্য তৃপ্ত হয়।

নৈবেদ্যদানের পর, একটু জল লইয়া ইদং পানার্থোদকং নমঃ হৌং শিবায় নমঃ, বলিয়া একটু জল দিবে। ইদং আচমনীয়োদকং (একটু জল) নমঃ হৌং শিবায় নমঃ, ইদং তাম্বুলং (অভাবে জল) নমঃ হৌং শিবায় নমঃ। যথাশক্তি ইষ্টদেবতার গায়ত্রী জপ করিবে। পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা শেষ করিবে। এষঃপুষ্পাঞ্জলিঃ গায়ত্রী পাঠ করিয়া নমঃ হৌং শিবায় নমঃ। নিত্য পূজা করিতে গিয়া যদি ঐ সমস্ত দ্রব্যের অভাব হয় বা বিশেষ অসুবিধা থাকে ঐ সমস্ত দ্রব্যের নাম করিয়া দ্রব্যের পরিবর্ত্তে একটু একটু জল দিবে।

তারপর—এতে গন্ধ-পুষ্পে নমঃ গৌর্য্যৈ নমঃ বলিয়া পুষ্প দিবে। পুরুষের পূজা করিলেই তাঁর প্রকৃতির পূজা করিতে হয়। আবার প্রকৃতির পূজা করিলেই তাঁর পুরুষের পূজা করিতে হয়। যথা—শিব ও গৌরী, কালী ও মহাকাল ভৈরব, জগদ্ধাত্রী ও শিব, অন্নপূর্ণা ও শিব, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীরাম ও শ্রীসীতা ইত্যাদি।

জপ :—এইখানে যথাশক্তি ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হয়। শাক্ত ও শৈবেরা রুদ্রাক্ষের মালায় জপ করিবে, বৈষ্ণবেরা তুলসী মালায় জপ করিবে। জপের মালা ৫০টী করিয়া গুটী বাঁধিয়া লইবে, একটী মেরু রাখিবে। এইভাবে দু'গাছা মালা গাঁথিয়া লইবে। এক গাছিতে জপ হইবে আর এক গাছিতে সংখ্যা রাখিবে। যে গাছিটীতে সংখ্যা রাখিবে, জপের মালা ছিড়িয়া গেলেও তাহাতে কোনদিন জপ করিবে না। আবার জপের মালাগাছিটীতে কোন দিন সংখ্যা রাখিতে ব্যবহার করিবে না। জপকালে কখনও মালার মেরু লঙ্ঘন করিবে না। মালার দুই মুখ সংযুক্ত করেছে যে গুটীটী তাহাকে মেরু বলে। যে গুটী হইতে জপ আরম্ভ করিবে, সেখানে একটী সূতা বাঁধিয়া রাখ, মনে কর উহা মালার মুখ। মালার মুখ হইতে জপ আরম্ভ করিয়া ৫০টী গুটি জপ হইয়া গেলে সংখ্যা রাখা মালাগাছটীর একটী গুটী ধরিবে। বামহাতে সংখ্যারাখার মালাগাছটী ধরিতে হয়। পুনশ্চ ঐস্থান থেকে বিলোমক্রমে জপ করিতে করিতে যেস্থানে সুতা বাঁধা আছে চলিয়া আসিবে। আবার একটী সংখ্যার গুটী ধরিবে। পুনরায় সূতাবাঁধা স্থান হইতে জপ আরম্ভ করিবে এইভাবে অনুলোমবিলোমক্রমে জপ করিবে আর সংখ্যা রাখিবে। সংখ্যার মালাগাছটী যখন শেষ হইবে, তখন আড়াই হাজার সংখ্যা জপ হইবে। একবার ইষ্ট-মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, একটী করিয়া গুটী ধরিবে এইভাবে জপ চলিবে।

জপ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সেঁতু বন্ধন করিয়া লইবে। ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যেমন মনে কর "হৌং" এই ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে ইহার সেতুবন্ধন নিম্নে দেখান হইল।

স্ত্রী ও শূদ্রজাতি এইরূপ সেতুবন্ধন করিবে—যথা—নমঃ হৌং নমঃ, নমঃ হৌং নমঃ, নমঃ হৌং নমঃ, নমঃ হৌং নমঃ নমঃ হৌং নমঃ, নমঃ হৌং নমঃ, নমঃ হৌং, এই পর্য্যন্ত বলিয়া মালার গুটী ধরিয়া হৌং হৌং.........এইভাবে জপ শেষ হইলে মালা ছাড়িয়া দিয়া বলিবে—নমঃ, নমঃ হৌং নমঃ, নমঃ হৌং নমঃ, নমঃ হৌং নমঃ, নমঃ হৌং নমঃ, নমঃ হৌঃ নমঃ, নমঃ হৌং নমঃ॥ ইহাই সেতুবন্ধন। উপবীতধারীগণ উল্লিখিত সেতুবন্ধনে নমঃ শব্দের পরিবর্ত্তে ওঁম্ ব্যবহার করিবেন। অন্যান্য সাধকগণ নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্রে ঐরূপ জপের পূর্ব্বে ও জপের শেষে সেতুবন্ধন করিয়া লইবেন। জপশেষে "গুহ্যাতি" ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবেন।

প্রত্যহ জপের সংখ্যা খাতায় নিয়মিতভাবে লিখিয়া রাখিবে, এইভাবে সাধক, এক কোটী সংখ্যক জপ সমাধা করিয়া শ্রীগুরুদেবের চরণে মালা বিসর্জ্জন করিবে অথবা নদীর জলে বিসর্জ্জন করিতে পারা যায়। কোটী জপ সমাধার পর কেবল ধ্যানস্থ থাকিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হয়, তখন সংখ্যা রাখার বা মালার প্রয়োজন হয় না। কোটী সংখ্যক জপ সমাধা হইলে, সাধক সাধন সোপানের অনেক উচ্চে আরোহণ

করেন। অনেকেই যথেষ্ট এই শক্তি লাভ করেন। জপ সমাধা করিয়া স্তব, কবচ পাঠ করিতে হয়। নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার স্তব কবচ মুখস্থ করিয়া লইবে। তারপর দেবতাকে প্রনাম করিবে।

শিবের নমস্কার

নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ, নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিনাকহস্তায়, বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ॥
নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণপূজা

তান্ত্রিক সন্ধ্যা ও শ্রীগুরুপূজা করিয়া পুনরায় আচমন করিবে। পূর্ব্বলিখিত শিবপূজার ন্যায় জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্রে প্রাণায়াম করন্যাস অঙ্গন্যাস, ধ্যান, মানস-পূজা, পুনর্ধ্যান ও আবাহন করিবে। তারপর দশোপচারে পূজা করিবে। যথা—এতৎপাদ্যং নমঃ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ইত্যাদি ক্রমে পূজাশেষ করিয়া শ্রীরাধার পূজা করিবে এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ রাং শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ। পরে গায়ত্রীজপ গায়ত্রীমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি, ইষ্টমন্ত্রজপ, কবচ ও স্তব ও প্রণাম করিবে।

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান

ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদন, বর্হাবতংস প্রিয়ং।
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্ ॥
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গো-গোপসংঘ্যাবৃতং।
গোবিন্দং কলবেণু-বদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকবচম্

নারদ উবাচ :—ভগবান্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ কবচং যৎ প্রকাশিতং।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কৃপয়া কথয় প্রভো ॥
সনৎকুমার উবাচ :—শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র, কবচং পরমাদ্ভুতং।
নারায়ণেন কথিতং কৃপয়া ব্রহ্মণে পুরা ॥
ব্রহ্মণা কথিতং মহ্যং পরং স্নেহাদ্ বদামি তে।
অতিগুহ্যতরং তত্ত্বং ব্রহ্মমন্ত্রৌঘবিগ্রহং ॥
যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ ব্রহ্মা সৃষ্টিং বিতনুতে ধ্রুবং।
যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ পাতি মহালক্ষ্মী র্জগত্রয়ম্ ॥
পঠনাৎ ধারণাচ্ছম্ভুঃ সংহর্ত্তা সর্ব্বমন্ত্রবিৎ।
বরদৃপ্তান্ জঘানৈব পঠনাদ্ধারণাদ্ যতঃ ॥
এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ।
ইদং কবচমত্যন্তগুপ্তং কুত্রাপি নো বদেৎ ॥
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ।
শঠায় পরশিষ্যায় দত্ত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥

ত্রৈলোক্যমঙ্গলাখ্যস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবো নারায়ণঃ স্বয়ম্।
(ওঁ বা নমো) প্রণবো মে শিরঃ পাতু নমো নারায়ণায় চ।
ভালং মে নেত্রযুগলমষ্টার্ণো ভক্তি-মুক্তিদঃ॥
ক্লীং পায়াচ্ছ্রোত্রযুগ্মং চৈকাক্ষরঃ সর্ব্বমোহনঃ।
ক্লীং কৃষ্ণায় সদাঘ্রাণঃ গোবিন্দায়েতে জিহ্বিকাম্॥
গোপীজনপদংবল্লভায় স্বাহাননং মম।
অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ কণ্ঠং পাতু দশাক্ষরঃ।
গোপীজনপদং বল্লভায় স্বাহা ভুজদ্বয়ম্।
ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাশয়ি নমঃ স্কন্ধৌ দশাক্ষরঃ॥
ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং করৌ পায়াৎ ক্লীং কৃষ্ণায়াঙ্গিজোঽবতু।
হৃদয়ং ভুবনেশানঃ ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং স্তনৌ মম॥
গোপালায়াগ্নিজায়ান্তং কুক্ষিযুগ্মং সদাবতু।
ক্লীং কৃষ্ণায় সদা পাতু পার্শ্বযুগ্মমনুত্তমম্॥
কৃষ্ণগোবিন্দকৌ পাতু স্মরাদ্যৌ ঙেযুতৌ মনুঃ।
অষ্টাক্ষরঃ পাতু নাভিং কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরোঽবতু॥
পৃষ্ঠং ক্লীং কৃষ্ণকঙ্কালং ক্লীং কৃষ্ণায় দ্বিঠান্তকঃ।
সক্থিনী সততং পাতু শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণঠদ্বয়ম্॥
উরূসপ্তাক্ষরঃ পায়াৎ ত্রয়োদশাক্ষরোঽবতু।
শ্রীং হ্রীং ক্লীং পদতো গোপীজনবল্লভপদং ততঃ॥
ভায় স্বাহেতি পায়ুং বৈ ক্লীং হ্রীং শ্রীং সদশার্ণকঃ।
জানুনী চ সদা পাতু হ্রীং শ্রীং ক্লীং চ দশাক্ষরঃ॥

ত্রয়োদশাক্ষরঃ পাতু জঙ্ঘে চক্রাদ্যুদায়ুধঃ।
অষ্টাদশাক্ষরো হ্রীং শ্রীং পূর্ব্বকো বিংশবর্ণকঃ॥
সর্ব্বাঙ্গং মে সদা পাতু দ্বারকানায়কো বলী।
নমো ভগবতে পশ্চাৎ বাসুদেবায় তৎপরম্॥
তারাদ্যো দ্বাদশার্ণোঽয়ং প্রাচ্যাং মাং সর্ব্বতোঽবতু।
শ্রীং হ্রীং ক্লীং চ দশার্ণস্তু ক্লীং হ্রীং শ্রীং ষোড়শার্ণকঃ॥
গদাদ্যুদায়ুধো বিষ্ণুর্মামগ্নের্দিশি রক্ষতু॥
হ্রীং শ্রীং দশাক্ষরো মন্ত্রো দক্ষিণে মাং সদাবতু।
তারো নমো ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় চ॥
স্বাহেতি ষোড়শার্ণোঽয়ং নৈ-ঋত্যাং দিশি রক্ষতু।
ক্লীং হৃষীকেশোপদেশায় নমো মাং বারুণেঽবতু॥
অষ্টাদশার্ণঃ কামান্তো বায়ব্যে মাং সদাবতু।
শ্রীং মায়া কামকৃষ্ণায় গোবিন্দায় দ্বিঠো মনুঃ॥
দ্বাদশার্ণাত্মকো বিষ্ণুরুত্তরে মা সদা বতু।
বাগ্‌ভবং কামকৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় ততঃপরম্॥
গোপীজনবল্লভান্তেভীয়ে স্বাহা চ সৌস্তভঃ।
দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো মামৈশান্যে সদাবতু॥
কালিয়স্য ফণামধ্যে দিব্যং নিত্যং করোতি তম্।
নমামি দেবকীপুত্রং নৃত্যরাজানমচ্যুতম্॥
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রোঽপ্যধো মাং সর্ব্বতোঽবতু।
কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি।
তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াদেষা মাং পাতু চোর্দ্ধতঃ॥

ইতি তে কথিতং বিপ্র ব্রহ্মমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচ ব্রহ্মরূপকম্॥
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতং।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ॥
গুরুং প্রণম্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেত্ততঃ।
সকৃদ্দ্বিস্ত্রি র্যথাজ্ঞানং সোঽপি সর্ব্বতপোময়ঃ॥
মন্ত্রেষু সকলেষ্বেব দেশিকো নাত্র সংশয়ঃ।
শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ॥
হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা তদ্ধারয়েদ্ধ্রুবম্।
যদিস্যাৎ সিদ্ধকবচো বিষ্ণুরেব ভবেৎ স্বয়ম্॥
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য পুরশ্চর্য্যাং বিধানতঃ।
স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় সততং লক্ষ্মীর্ব্বাণী বসেত্ততঃ॥
পুষ্পাঞ্জল্যাষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
দশবর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ॥
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ॥
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজপেয়শতানি চ।
মহাদানানি যান্যেব প্রাদক্ষিণ্যং ভূবস্তথা।
কলাং নার্হন্তি তান্যেব সকৃদুচ্চারণাত্ততঃ।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ॥

ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেৎ যঃ পুরুষোত্তমম্।
শতলক্ষপ্রজপ্তো হি মন্ত্রস্তস্য ন সিধ্যতি।
ইতি সনৎকুমারতন্ত্রে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম শ্রীকৃষ্ণকবচং সমাপ্তম্।

শক্তিপূজা।

দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি শক্তিমন্ত্রে যাঁহারা দীক্ষিত; তাঁহারা শ্রীগুরুপূজা সমাধা করিয়া, পূর্ব্বলিখিত শিবপূজার অনুকরণে নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্রে প্রাণায়াম, করন্যাস, অঙ্গন্যাস প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি করিবেন। নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিবেন। নিম্নে কতকগুলি ধ্যান কবচ ও স্তব দেওয়া হইল। যাহার যিনি ইষ্টদেবতা, তদনুকূল মুখস্থ করিয়া লইবেন।

দক্ষিণকালিকার ধ্যান

(ওম্ বা নম) মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শবশিবারূঢ়াং
ত্রিনেত্রাং পরাং,
কর্ণালম্বিতবাণযুগ্মভয়দাং মুণ্ডস্রজাং মালিনীম্।
বামাধোহূর্দ্ধকরাম্বুজে নরশিরঃ খড়্গঞ্চ সব্যেতরে,
দানাভীতিবিমুক্তকেশনিচয়াং বন্দে সদা কালিকাম্॥

এতৎ পাদ্যং হ্রীং বা ক্রীং নমঃ দক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ ইত্যাদি। এতে গন্ধপুষ্পে মহাকালভৈরবায় নমঃ ইত্যাদি বিশেষ। অন্যান্য সমস্তই শিবপূজাবৎ॥

দক্ষিণকালিকাকবচম্।

শ্রীভৈরব উবাচ।

কালিকা যা মহাবিদ্যা কথিতা ভুবি দুর্লভা।
তথাপি হৃদয়ে শল্যমস্তি দেবি কৃপাং কুরু॥
কবচন্তু মহাদেবি কথয়স্বানুকম্পয়া।
যদি নো কথ্যতে মাত র্বিমুঞ্চামি তদা তনুম্॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

শঙ্কাপি জায়তে বৎস, তব স্নেহাৎ প্রকাশ্যতে।
ন বক্তব্যং ন দ্রষ্টব্যমতিগুহ্যতরং মহৎ॥
কালিকা জগতাং মাতা শোকদুঃখবিনাশিনী।
বিশেষতঃ কলিযুগে মহাপাতকহারিণী॥
কালী মে পুরতঃ পাতু পৃষ্ঠতশ্চ কপালিনী।
কুল্যা মে দক্ষিণেপাতু কুরুকুল্যা তথোত্তরে॥
বিরোধিনী শিরঃ পাতু বিপ্রচিত্তা চ চক্ষুষী।
উগ্রা মে নাশিকাং পাতু কর্ণে চোগ্রপ্রভা মতা॥
বদনং পাতু মে দীপ্তা নীলা চ চিবুকং সদা।
ঘনা গ্রীবাং সদা পাতু বলাকা বাহুযুগ্মকম্॥

মাত্রা পাতু করদ্বন্দং বক্ষো মুদ্রা সদাবতু।
মিতা পাতু স্তনদ্বন্দং যোনিমণ্ডল-দেবতা॥
ব্রাহ্মী মে জঠরং পাতু নাভিং নারায়ণী তথা।
উরুং মাহেশ্বরী নিত্যং চামুণ্ডা পাতু লিঙ্গকম্॥
কৌমারী চ কটিং পাতু তথৈব জানুযুগ্মকম্।
অপরাজিতা পাদৌ মে বরাহী পাতু চাঙ্গুলীঃ॥
সন্ধিস্থানং নারসিংহী পত্রস্থা দেবতাবতু।
রক্ষাহীনন্তু যৎস্থানং বর্জ্জিতং কবচে ন তু॥
তৎসর্ব্বং রক্ষ মে দেবি, কালিকে ঘোরদক্ষিণে।
ঊর্দ্ধমধস্তথা দিক্ষু পাতু দেবী স্বয়ং বপুঃ॥
হিংস্রেভ্যঃ সর্ব্বদা পাতু সাধকঞ্চ জলাদিকাৎ।
দক্ষিণা কালিকা দেবী ব্যাপকত্বে সদাবতু॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো জপেদ্দেবদক্ষিণাম্।
ন পূজাফলমাপ্নোতি বিঘ্নস্তস্য পদে পদে॥
কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র যত্রৈব গচ্ছতি।
তত্র তত্রাভয়ং তস্য ন ক্ষোভং বিদ্যতে কচিৎ॥
ইতি কালীকুলর্ব্বস্বে দক্ষিণকালিকা-কবচং সমাপ্তম্।

জগদ্ধাত্রী দুর্গার ধ্যান

সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং,
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং।

শঙ্খসারঙ্গসংযুক্ত-বামপাণিদয়ান্বিতাং,
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে।
রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশীতনুম্,
নারদাদ্যৈর্ম্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীং।
ত্রিবলীবলয়োপেতনাভিনালমৃণালিনীং,
রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে,
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্॥

"দূং নমঃ জগদ্ধাত্র্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে। নমো শিবায় নমঃ ইত্যাদি বিশেষ।

জগদ্ধাত্রী-কবচম্

অস্য শ্রীজগদ্ধাত্রীকবচস্য নারদর্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীজগদ্ধাত্রীদেবতা হ্রীং বীজং দূং শক্তিঃ স্বাহা কীলকং সর্ব্বমঙ্গলার্থে বিনিয়োগঃ। (মূর্দ্ধাদিষু ন্যসেৎ)

শ্রীশিব উবাচ।

(ওঁ বা নমঃ) অতিগুহ্যতমং দেবি কবচং কথয়ামি তে।
যদ্ধৃত্বা দেবদেবেশি দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥
ব্রহ্মাপি ব্রহ্মবিদ্ভূত্বা স্বকার্য্যে শক্তিমানভূৎ।
কিমন্যে ত্বম্মহাপুণ্যং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্।
পাবনং পরমং দিব্যং দেবতানাং সুদুর্ল্লভম্।
মহাশক্তিকরং শান্তং সর্ব্বমঙ্গলকারণম্॥

সর্ব্বব্যাধিহরং সর্ব্বসুখদং কামদং সদা।
নারদশ্চ ঋষিঃ প্রোক্তো গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে ॥
দেবতা চ জগদ্ধাত্রী মায়াবীজন্তু বীজকম্।
দূং শক্তিঃ কীলকং দেবি বহ্নিকান্তাস্থ দেবিকা ॥
(ওঁ বা নমঃ) দূং বীজং মে শিরঃপাতু বদনে ত্র্যক্ষরীপরা।
হ্রীং দূং ফট্ পাতু বৈ কণ্ঠে হ্রীং দূং স্বাহা চ নাসিকাম্ ॥
স্ত্রীং দূং ফট্ হৃদয়ে পাতু ক্লীং দূং ফট্ স্তনযুগ্মকে।
ঐঁ দূং স্বাহা পাতু কুক্ষৌ ওঁ দূং ফট্ কটিদেশকে ॥
ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষাণি স্বাহেতি সর্ব্বসন্ধিষু॥
সর্ব্বকামেষু সর্ব্বত্র জগদ্ধাত্রী সদাবতু।
সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ জগদ্ধাত্রী জয়প্রদা ॥
পাতু মাং পরমেশানী পরিবারগণৈরপি।
আদ্যা ব্রহ্মময়ী দুর্গা জগদ্ধাত্রী জয়প্রদা ॥
অন্নদা ত্রিপুটা দুর্গা ত্বরিতা সিংহবাহিনী।
সরস্বতী তথা লক্ষ্মীর্জয়দুর্গাভয়া তথা ॥
ভুবনেশী মহেশী চ বজ্রপ্রস্তারিণী পরা।
পরিবারগণান্ পায়াদেতান্ পর্ব্বতকন্যকা।
জয়াদ্যাঃ পান্তু সর্ব্বত্র ইন্দ্রাদ্যাঃ পান্তু সর্ব্বদা ॥
ইতি তে কথিতং দেবি সর্ব্বমঙ্গলকারণম্।
ধারণাৎ পঠনাৎ প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বমঙ্গলমাপ্নুয়াৎ ॥
নাতঃ পরতরং দেবি ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং নাত্রকার্য্যা বিচারণা ॥

ঘটং বিচিত্রং সংস্থাপ্য তাম্রাদিপাত্রমধ্যগে।
গোরোচনাগুগ্ গুলুভ্যাং কুঙ্কুমাগুরুচন্দনৈঃ ॥
সাধকেন লিখিত্বা চ মালীকৃতমিদং পুনঃ।
স্থাপয়িত্বা প্রতিষ্ঠাপ্য ততশ্চ শোধনঞ্চরেৎ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি, সারাৎসারং পরাৎপরম্।
ন কস্যচিৎ প্রদাতব্যং গোপিতং শাস্ত্রসঞ্চয়ে ॥
ইতি আগমমহার্ণবে হরপার্ব্বতীসংবাদে জগদ্ধাত্রীকবচম্ সমাপ্তম্।

অন্নপূর্ণাস্থ ধ্যান

(ওঁ বা নমঃ) রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়—
মন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাং।
নৃত্যন্তমিন্দু শকলাভরণং বিলোক্য।
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্ ॥

"হ্রীং (ওম্ বা নমঃ) অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে। নমো শিবায় নমঃ ইত্যাদি বিশেষ। অন্যান্য শিবপূজাবৎ।

অন্নপূর্ণাকবচম্

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কথিতাশ্চান্নপূর্ণায়া যা যা বিদ্যাঃ সুদুর্ল্লভাঃ।
কৃপয়া কথিতাঃ সর্ব্বাঃ শ্রুতাশ্চ বিবিধা ময়া ॥
সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং যৎ পুরোদিতম্।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু পার্ব্বতি বক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং ব্রহ্মনামকম্॥
ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপঞ্চ মহদৈশ্বর্য্যদায়কম্।
পঠনাদ্ধারণান্মর্ত্ত্যস্ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যবান্ ভবেৎ॥
ত্রৈলোক্যরক্ষণস্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ।
ছন্দোবিবাড়ন্নপূর্ণা দেবতা সর্ব্বসিদ্ধিদা।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
হ্রীং নমো ভগবত্যন্তে মাহেশ্বরী পদং ততঃ।
অন্নপূর্ণে ততঃ স্বাহা চৈষা সপ্তদশাক্ষরী॥
পাতু মামন্নপূর্ণা সা যা খ্যাতা ভুবনত্রয়ে।
বিমায়া প্রণবাদ্যৈষা তথা সপ্তদশাক্ষরী॥
পাত্বন্নপূর্ণা সর্ব্বাঙ্গং রত্নকুম্ভান্নপাত্রদা।
শ্রীবীজাদ্যা যদা চৈষা দ্বিরন্ধ্রার্ণা যথাসুখম্॥
প্রণবাদ্যা ভ্রুবৌ পাতু কণ্ঠং বাগ্‌বীপূর্ব্বিজা।
কামবীজাদিকা চৈষা হৃদয়ন্তু মহেশ্বরী॥
তারং শ্রীং হ্রীং নমোঽন্তে চ ভগবতীপদং ততঃ।
মাহেশ্বরী পদঞ্চান্নপূর্ণে স্বাহেতি পাতু মে॥
নাভিমেকোনবিংশার্ণা পায়ান্মাহেশ্বরী সদা।
তারং মায়া রমা কামঃ ষোড়শার্ণাস্ততঃপরম্॥
শিরঃস্থা সর্ব্বদা পাতু বিংশত্যর্ণাত্মিকা চ যা।

করৌ পাদৌ সদা পাতু রমা কামো ধ্রুবস্তথা।
ধ্বজঞ্চ সর্ব্বদা পাতু বিংশত্যর্ণাত্মিকা চ যা।
অন্নপূর্ণা মহাবিদ্যা হ্রীং পাতু ভুবনেশ্বরী।
শিবঃ শ্রীং হ্রীং তথা ক্লীঞ্চ ত্রিপুটা পাতু মে গুদম্॥
ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন ষড়ঙ্গানি পুনন্তু মাং।
ইন্দ্রো মাং পাতু পূর্ব্বে চ বহ্নিকোণেঽনলোঽবতু॥
যমো মাং দক্ষিণে পাতু নৈঋর্ত্যাং নিঋর্তিস্তথা।
পশ্চিমে বরুণঃ পাতু বায়ব্যাং পবনোঽবতু।
কুবেরশ্চোত্তরে পাতু মামৈশান্যাং শিবোঽবতু॥
ঊর্দ্ধাধঃ সততং পাতু ব্রহ্মানন্তো যথাক্রমাৎ॥
বজ্রাদ্যাশ্চায়ুধাঃ পান্তু দশ দিক্ষু যথাক্রমাৎ।
ইতি তে কথিতং পুণ্যং ত্রৈলোক্যরক্ষণং পরম্।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্দেবাঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ধারণাৎ পঠনাদ্ যতঃ।
সৃজত্যবতি হন্ত্যেব কল্পে কল্পে পৃথক্ পৃথক্॥
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দেব্যৈ মূলেনৈব পঠেত্ততঃ।
যুগাযুতকৃতায়াস্তু পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ॥
প্রীতিমন্যোঽন্যতঃ কৃত্বা কমলা নিশ্চলা গৃহে।
বাণী বক্ত্রে বসেত্তস্য সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
অষ্টোত্তরশতঞ্চাস্য পুরশ্চর্য্যা-বিধিঃ স্মৃত।
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি সর্ব্বতপোময়ঃ॥

ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি তৎপাত্রং প্রাপ্য পার্ব্বতি।
মাল্যানি কুসুমান্যেব ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥
ইতি ভৈরবতন্ত্রে ভৈরবভৈরবীসংবাদে অন্নপূর্ণাকবচং সমাপ্তম্॥

প্রত্যেক দীক্ষিত নর নারীর নিজ নিজ ইষ্টদেবতার কবচ ধারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কবচ ধারণের ফলে শক্তিলাভ হয়, পূজাদির ত্রুটী হইলেও দেবতা প্রসন্ন থাকেন। পূজা-জপ যতই সুন্দর হউক, কবচধারণ ও পাঠ না হলে সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। সদাশিব প্রত্যেক কবচকীর্ত্তনেই ঐরূপ উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং ইহার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন।

বিশ্বরূপাস্তোত্রম্

(ওঁ বা নমঃ) ত্বংচন্দ্রসূর্য্যরূপাশি তব রূপং বিরাজতে।
নক্ষত্রগ্রহরূপেণ তবজ্যোতিঃ প্রকাশতে॥
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে চ বিষ্ণুলোকে চ বৈষ্ণবী।
রুদ্রাণী ত্বং রুদ্রলোকে শোভিতা ভব-সুন্দরী॥
ইন্দ্রলোকে শচীরূপা বারুণে বারুণী তথা।
স্বাহারূপধরা দেবি, বহ্নিশক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥
পিতৃলোকে স্বধারূপা পিতৃতৃপ্তিপ্রদায়িনী।
শ্রদ্ধারূপা মহামায়ে হৃদয়ে পিতৃযাজিনাম্॥

তর্পণে তৃপ্তিরূপা ত্বং ত্যাগে চ ত্যাগরূপিণী।
সলিলে শৈত্যরূপাত্বমনলে দাহিকা তথা॥
সাধূনাং হৃদয়ে মাতরানন্দস্ত্বং বিরাজসে।
পবিত্রতা চ সাধ্বীনাং মাতৃণাং স্নেহরূপিণী॥
দাতৃণাং হৃদয়ে দানং ভোক্তৃণাং ভোজনং তথা।
কামিনাঞ্চ হি কামশ্চ ক্রোধিনাং ক্রোধরূপিণী॥
লোভিনাং হৃদয়ে মাত র্লোভরূপা বিরাজসে।
মদমোহাদিরূপা হি মদমোহাদিসেবিনাম্॥
সাত্ত্বিকহৃদয়ে মাত র্নিত্যশান্তিঃ প্রভাজসে।
আসক্তিরূপিণী দেবী রজোগুণনিষেবিনাম।
তামস-হৃদয়ে মাতরজ্ঞানরূপধারিণী।
মিথ্যাদিবিষয়ে সুপ্তা বিবেকভ্রংশকারিণী॥
লালনে মাতৃরূপা ত্বং পিতৃরূপা চ পালনে।
পত্নীরূপধরা দেবি তোষণে পোষণে তথা॥
সংসারবদ্ধজীবানাং মায়াপাশ-বিমোচনে।
গুরুরূপা মহাদেবি করুণাময়রূপিণী॥
শাসনে শিষ্যরূপা ত্বং শোষণে দস্যুরূপিণী।
সন্ততিরূপিণী মাতঃ সংসার-দৃঢ়বন্ধনে॥
তৃষ্ণার্ত্তানাঞ্চ রক্ষার্থং পথিমধ্যে তু চ দীর্ঘিকা।
পথিকক্লান্তিনাশায় ছায়ারূপা বিরাজসে॥
বিহঙ্গমাদিরূপেণ নীলাকাশে বিরাজসে।
ব্যাধরূপেণ কেন ত্বমূর্দ্ধদৃষ্টি র্মহীতলে?

রজোগুণান্বিতা দেবি বিশ্বসৃষ্টিপ্রকাশিনী।
ত্বং ব্রহ্মা বেদস্মত্তা চ বিধিরূপা বিরাজসে॥
সত্ত্বগুণৈর্যুতা মাতর্বিশ্বস্থিতিস্বরূপিণী।
ত্বং বিষ্ণুঃ কমলাস্তশ্চিৎস্বরূপা প্রবর্ত্তসে॥
তমোগুণময়ী মাতঃ সংহাররূপধারিণী।
ত্বং দেবি রুদ্রমূর্ত্তিশ্চ জরামৃত্যুবিধারিনি॥
শঙ্খাসুরবধে দেবি মৎস্যরূপবিধারিণী।
উদ্ধৃতাঃ সকলা বেদা দত্তাশ্চ ব্রহ্মণে পুরা॥
কূর্ম্মরূপা মহাদেবি বিশ্বাধারস্বরূপিণী।
সমুদ্রে মথিতে মাতর্বাসুকি-মন্দরাদিভিঃ॥
সদা পৃথ্বী নিমগ্নাসীৎ কারণে সলিলে পুরা।
উদ্ধৃতা দশনৈ মাতর্বরাহরূপধারিণী॥
প্রহ্লাদ-প্রার্থনে দেবি হিরণ্যকশিপোর্বধে।
নৃসিংহরূপিণী মাতঃ স্তম্ভমধ্যে প্রকাশিতা॥
দাতৃদান-নিরাসার্থং ছলিতশ্চ বলিঃ পুরা।
বামনরূপিণী মাতস্ত্রিঃ পাদৈর্বাপিতং জগৎ॥
দৃপ্তক্ষত্রবিনাশায় পরশু-রাম-রূপিণী।
সপ্ত সপ্ত পুনঃ সপ্ত ক্ষত্রকুলান্তকারিণী॥
রঘুবংশে সমদ্ভূতা পিতৃসত্যপ্রপালিনী।
রামরূপেণ দেবি ত্বং রাবণকুলনাশিনী॥
বলরামস্বরূপেণ প্রলম্বাসুরঘাতিনী।
হল-প্রকর্ষণেনৈব শাসিতা পুষ্কলা মহী॥

সাম্রাজ্যলালসা দেবি পরিত্যক্তা চ হেলয়া।
বুদ্ধভাবেন বুদ্ধস্ত্বং নির্ব্বাণপথদর্শিনী॥
যদাহি ম্লেচ্ছভাবেন ব্যভিচারোঽতিবর্দ্ধতে।
কল্কিরূপেণ মাতস্ত্বং ম্লেচ্ছনাশং করিষ্যসি॥
যমুনাপুলিনে মাতর্বৃন্দাবনবিহারিণী।
স্বশক্তি-গোপীভিঃ সার্দ্ধং রাসস্থকৃষ্ণরূপিণী॥
ইত্থং যানি চ রূপাণি তিষ্ঠন্তি বিশ্বমণ্ডলে।
সর্ব্বত্র তব রূপাণি বহুনা কিং বদাম্যহম্॥
ত্বং লীলা বিশ্বরূপা হি মায়ারজ্জুস্বরূপিণী।
কো যাতি বন্ধনান্মুক্ত ইচ্ছাময়ীকৃপাং বিনা॥
অধুনা বিপুলা চিন্তা স্বল্পায়ুশ্চ কলৌযুগে।
জীবনং বিফলং মাতঃ কৃপয়া সফলং কুরু॥
সংসারচক্রমারূঢ়ো মায়াদণ্ডৈর্বিঘূর্ণিতঃ।
দণ্ডস্য দণ্ডদানেন স্থিরচক্রঞ্চ মাং কুরু॥
আজ্ঞাপথে সহস্রারে পূর্ণশান্তিপ্রপূরিতে।
তত্র মাং নয় মে মাতঃ কৃপয়া জনবৎসলে॥
তর্কেন ন হি প্রাপ্নোমি তর্কাতীতা প্রকীর্ত্তিতা।
কেবলং ভক্তিমাত্রেণ ত্বৎকৃপা লভ্যতে নরৈঃ॥
অনন্তভক্তিযোগেন ভক্তেন সহ মোদসে।
ন্যায়াদিদর্শনেনাপি ত্বত্ত্বং নাবগম্যতে॥
বিশ্বাসগোমুখাজ্জাতা ভক্তিগঙ্গাপ্রবাহিনী।
প্রেমসাগররূপিণ্যাং নির্ব্বাণং ত্বয়ি গচ্ছতি॥

ভক্তবশ্যা শ্রুতা ত্বং হি নান্যবশ্যা কদাচন।
অতোঽহং প্রার্থয়ে মাতস্ত্বয়ি ভক্তিং সুদুর্ল্লভাম্।
ইতি শ্রীভূপতিবিরচিতং বিশ্বরূপাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

সংক্ষিপ্ত নিত্য উপাসনা।

প্রত্যেক দীক্ষিত সন্তান নিম্নলিখিতক্রমে প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিত্য উপাসনা করিতে পারিবেন।

১। আচমন :—ওঁ (নমঃ) আত্মতত্ত্বায় স্বাহা (নমঃ), ওঁ (নমঃ) বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা (নমঃ) ওঁ (নমঃ) শিবতত্ত্বায় স্বাহা (নমঃ) এইভাবে ঐ তিনটী মন্ত্র তিনবিন্দু জলপান করিয়া আচমন করিবেন। নিত্য উপসনায় জল পুষ্পাদির একান্ত অভাব ঘটীলে কেবল মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিলেই চলিবে। নিত্যকর্ম্মে অঙ্গহানি হইলেও কর্ম্মের ক্ষতি হইবে না। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"নিত্যং যথাশক্তি কুর্য্যাৎ।

২। তৎপরে জলশুদ্ধি, আচমনশুদ্ধি (১৩৬ পৃঃ) করন্যাস (১৩৯ পৃঃ) করিবেন। তৎপরে শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিয়া ঐং শ্রীগুরবে নমঃ (স্ত্রী,শূদ্র বলিবেন ঔং শ্রীগুরবে নমঃ) এই মন্ত্র যথা শক্তিজপ করিয়া শ্রীগুর্ব্বাষ্টক ও শ্রীগুরুকবচ (পৃঃ ১৪৯) পাঠ করিবেন।

৩। তৎপরে স্বস্ব ইষ্টদেবতার গায়ত্রী যথাশক্তি পাঠ করিবেন। (১৪২ পৃঃ)

৪। গন্ধ, পুষ্প নৈবেদ্যাদির অভাব ঘটিলে মনে মনে উৎকৃষ্ট দ্রব্যসম্ভার কল্পনা করিয়া পূজা করিবেন। অর্থাৎ মনে মনে সপ্তসমুদ্রের জল দিয়া ইষ্টদেবতাকে স্নান করাইবেন, পারিজাত কুসুমের মালা পরাইয়া দিবেন, উৎকৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রী নিবেদন করিবেন। চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্রের আলোক মালায় আরতি করিবেন। এইরূপ কল্পনা করিয়া পূজা অভ্যাস করিতে হয়। শেষে মহাপূজার অধিকারী হওয়া যায়।

৫। যথাশক্তি ইষ্টমন্ত্রজপ। অর্থাৎ যে মন্ত্র শ্রীগুরুদেব কর্ণের মধ্য দিয়া মর্ম্মে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

৬। ইষ্টকবচ ও বিশ্বরূপ অথবা যথেচ্ছা স্তোত্রাদি পাঠ ও প্রণাম।

৭। প্রত্যেক দীক্ষিত সন্তান দিবারাত্রি যতটা সম্ভব হাতে কাজ করিবেন আর জিহ্বামূলে ইষ্টমন্ত্র জপিবার অভ্যাস করিবেন। অন্ততঃ নিদ্রা যাইবার সময় জিহ্বামূলে ইষ্টমন্ত্রজপ করিতে করিতে নিদ্রা যাইবেন, আবার নিদ্রা ভাঙ্গিলেই জিহ্বা মূলে পূর্ব্বোক্ত জপ চালাইতে থাকিবেন। ইহাতে শুচি অশুচি বিচারের প্রয়োজন নাই। গুরুদত্ত মহামন্ত্র উচ্চারণের প্রভাবে অশুচিতা শুচিতায় পরিণত হয়। দীক্ষিত সন্তানমাত্রেই স্মরণ রাখিবেন, কলিযুগে গুরুদত্ত মন্ত্রজপই একমাত্র সাধন। তন্ত্রের ঋষি বলিতেছেন :—

"শয়নে ভোজনে চৈব ব্যসনে বিপদি তথা।
গুরুদত্তং মহামন্ত্রং মুক্তিকামীজপেৎ সদা॥"
"নিত্য-উপাসনা ভুলে না খাইবে জল,
দুঃখরাশি বিদূরিতে মনে পাবে বল।
স্বদেশে বিদেশে কিংবা সুখেদুঃখে থাক,
সকল কাজের মাঝে নিত্য তাঁকে ডাক।"
(সাধন-সোপান তৃতীয় ভাগ)

সম্পূর্ণম্।

১। স্বদেশীযুগের লাঞ্ছিত অক্লান্তকর্ম্মী স্বদেশপ্রেমিক সুসাহিত্যিক, আত্মদর্শী শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয় লিখিতেছেন—

পণ্ডিত সাধকবর শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের লিখিত "সাধন-সোপান" পরমার্থজগতের এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' এই দুর্গম পথে সত্যকার আলো দেবার লোক বড় কম। এই পথের তাই শ্রোতাও আশ্চর্য্য, বক্তাও আশ্চর্য্য—দুইই দুর্ল্লভ। পণ্ডিত অনেক আছেন, বুদ্ধিচাতুর্য্যে, শাস্ত্রব্যাখ্যানে তাঁদের অভাব নাই,—চিত্তবিভ্রান্তকারী 'পাণ্ডিত্য ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে'। শ্রোতার মগজে সে সব গুরুগম্ভীর জ্ঞানমুষল দুর্দ্দম আঘাত করে মাত্র, অজ্ঞান নাশ করা দূরে যাক্, আরও কুজ্মটিকার সৃষ্টি করে তোলে। তত্ত্ববস্তু মনবুদ্ধির অগোচর, তাকে বুদ্ধির ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা ব্যর্থ তো হবেই। সূর্য্যকে দেখতে প্রদীপ জ্বালার আয়োজনের মত এই সব বাগবৈখরী লেখা

প্রহসনে পর্য্যবসিত হয়। বিদ্বান মানসচক্ষুরা এ সব লেখা তারিফ করে পড়েন বটে, কিন্তু এসবের সাহায্যে সেই সূক্ষ্মজ্যোতির ভূমিতে পাদমেকং এগোতে পারেন না, ভূপতিচরণ ঠাকুরের লেখা এই জাতীয় বুদ্ধির কসরৎ নয়। এ হচ্ছে intuitive writing প্রজ্ঞাদীপ্ত। সাধনায় প্রত্যক্ষ অনুভূতি পাওয়া মানুষের লেখা অল্প-বিস্তর এমনই হয়।

সাধনসোপানে এক কর্ত্তৃত্ববোধ কথাটি আমার খুব ভাল লেগেছে, সাধকের মূল কথাই এই। বিন্দু গলে' সিন্ধুর একাকার, মাঠের আমি হয়ে আসছে ক্রমশঃ হাটের আমি। সেই অবস্থাই জীবত্ব লীন হয়ে শিবত্ব লাভের আরম্ভ। প্রত্যেক সিদ্ধ সাধকের আছে ঐ একই সনাতন সত্যটাকে বলে' বোঝাবার এক নিজস্ব মৌলিক ধারা, স্বতঃ প্রকাশভঙ্গী; ভূপতি ঠাকুরেরও বোঝাবার ধারা একেবারে নিজস্ব, চর্ব্বিত চর্ব্বণ এখানে প্রায়ই নাই। এঁর সাধন-সোপান ও ইনি স্বয়ং আশাকরি, বহু পিপাসু নরনারীকে হাত ধরে' ঐ ক্ষুরের ধারের মত দুর্গম পথে কিছু দূর এগিয়ে দেবেন, খুব সম্ভব, দিচ্ছেনও তাই। ঐ মহৎ ব্রতই জগতের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ও মহাপুরুষব্রত, জীবন সার্থক করা, মনপ্রাণ চরিতার্থ করা এই খাঁটী ধর্ম্মদানই শ্রেষ্ঠদান। যে সাক্ষাৎ ভগবতীর শক্তিসঞ্চার যন্ত্র হয়ে মানুষকে এ জ্যোতি দেয় ও যে হৃদয়-মন মেনে নেয়, দু'জনই ধন্য। ফলে দু'জনেরই সকল বাঁধন খুলে যায় অন্তরের নিদ্রিত দেবতা জেগে ওঠে।